কৈশোরের দিন

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী

দাস প্রেস

৫২ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ

কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ :

এস-স্কোয়ার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

বাঁধাই :

নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পরিবেশক :

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ

২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা ১২

দাম : তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ হালদার
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের কিছু কিছু সূত্র ধরে ও চরিত্র অবলম্বন করে এই ছোট উপন্যাসটি লিখেছি। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর প্রভেদ অনেক। তাই এ উপন্যাস তথ্যপিপাসু পাঠকের চেয়ে রসপিপাসু পাঠকের কাছে বেশী আকর্ষণীয় মনে হবার কথা।

বইটি উৎসর্গ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ হালদার ও শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ অশেষরূপে আমার মঙ্গল কামনা করেন। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে এঁদেরই বইটি উৎসর্গ করলাম।

লেখক

সুগভীর অন্ধকারে বিস্তীর্ণ বালুকা তটে একটি খর্জুর বৃক্ষের নীচে মাথায় হাত রেখে বসে সে। তার দক্ষিণ দিকে একটি ছোট মহুয়া গাছ। তারও পরে কিছু কিছু বুনো গাছের চারা। আরও দক্ষিণে এই ছোট ছোট চারার মাঝে মাঝে মহুয়া আর শাল গাছ ছড়িয়ে আছে, ক্রমে ঘন হয়ে এক গভীর অরণ্য সৃষ্টি করেছে। গভীর রাত্রে অরণ্যে থাকা নিরাপদ নয় ভেবেই হয়তো ও বেরিয়ে এসেছে অচিরবতী নদীপ্রান্তে। বালুতটে বসে আছে একা।

যোজন বিস্তৃত ধু ধু বালুচরে বাতাসের বেগ কিঞ্চিৎ বেশী। বাতাসের সঙ্গে ধূলাকণা উড়ে এসেছে ওর তৈলহীন রুক্ষ চুলে আর চোখেমুখে। ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। আরক্তিম ছুটো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে অচিরবতীর কালো জলের স্রোতের দিকে।

এই স্রোতের জলে সে তার প্রাণের সবচেয়ে প্রিয় যে তাকে বিসর্জন দিয়েছে। এ অকাল বিসর্জনের বেদনায় ক্লিষ্ট হয়েই শুধু ওঠেনি, সর্বাঙ্গে এক অসহ্য জ্বালা অনুভব করছে।

অসহ্য! আর সহ্য করা যায় না। সহ্য করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সে এতকাল, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আজ সে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ বৃশ্চিকের দংশনের যাতনায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে অন্তরে। বাইরে কিন্তু সে নীরব নিস্পন্দ। বেদনার আর যন্ত্রণার বেগ ভেতরে তাকে যত বেশী ক্ষতবিক্ষত করছে, ততই সে বাইরে যেন অবশ হয়ে পড়ছে। শরীরে বুঝি একটুও জল নেই। চিন্তাও যেন শরীরের মতই অনড় হয়ে আছে।

কে জানে এই স্তম্ভিত স্থিরতা কোন ঝটিকার পূর্বাভাস কিনা।

বিগত কয়েক দিন অরণ্যবাস করছে সে। অরণ্যবাস ছাড়া আর তার উপায়ই বা কি? মানুষ সহ্য করতে আর সে পারবে না। পশুও বোধহয় মানুষের চেয়ে ভাল, তাই পশুর সঙ্গই তার আজ কাম্য। পশু যদি তাকে বধ করে, একবারেই বধ করবে। মানুষের মত তিলে তিলে মারবে না। কয়েক দিনের অনাহারে শ্রান্ত হলেও ভেতরের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় শ্রান্তি অনুভব করতে পারছে না। সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে যেন।

একটা শব্দ পেয়ে একটু নড়ে উঠল। শব্দটা শুষ্ক পত্রের ওপর কারো চলার শব্দ।

তাকাল চারদিকে। কে আবার এলো এখানে? কই কেউ নয় তো! বোধহয় মনের ভুল। আবার স্থির হয়ে বসল।

তাকাল সামনে। অচিরবতীর স্রোতের ওপারে ঘুমন্ত শ্রাবস্তী নগরী। আলো নেই কোথাও। শুধু মহাবিহারের সুউচ্চ চূড়া দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে ছায়ার মত। আর দেখা যাচ্ছে রাজপ্রাসাদের সুবর্ণমণ্ডিত শীর্ষ।

চোখ দুটো জ্বলে ওঠে ওর। নিষ্পলক চোখে তাকিয়েই থাকে। কিছু যে ভাবছে ও তা নয়। ভাববার মত মনের অবস্থা নয়। কেন তবে চোখ দুটো জ্বলে উঠল ওর কে জানে।

আবার পায়ের শব্দ। আরও নিকটে—অতি স্পষ্ট পায়ের শব্দ।

চমকে উঠে পড়ে ও। উঠেই দেখতে পায়।

অন্য কোন মানুষ হলে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়তো। কিন্তু ও স্থির হয়ে দাঁড়াল। সুদীর্ঘ বলিষ্ঠদেহী ক্রীতদাস উপালী সে।

এখন তার জীবনের মায়াও আর নেই। তাই সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দেখল, বেশ বড় একটি নেকড়ে বাঘ তার দিকেই এগিয়ে

আসছে। নেকড়ের চোখ দুটোও জ্বলছে। অতি হিংস্র সে চোখ।

উপালীর চোখ তার চেয়েও বেশী হিংস্র হয়ে ওঠে। ও ত্বড়িৎবেগে দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে ছোট মহুয়া গাছটা টেনে তুলে ফেলে।

অসাধারণ শক্তি ওর শরীরে। উত্তেজনায় সে শক্তি যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

গাছটা হাতে নিয়ে নেকড়ের সামনে ও এগিয়ে চলে এবার।

নেকড়ে বাঘটা বোধকরি বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়। এতকালের ভেতর সে-ও বোধহয় এমন মানুষ দেখেনি যে তার দিকে একটা গাছের কাণ্ড নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

উপালী কিন্তু থামে না। সুদৃঢ় ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়েই চলেছে।

অকস্মাৎ দৌড়ে গাছটা তুলে গিয়ে নেকড়েটার ওপর একটা ঘা লাগায় শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে।

নেকড়ের গায়ে সেটা ঠিক লাগে না। নেকড়েটা ছুটে গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় মুহূর্তে। যদি লেগেও থাকে, তার ঠিক মাথায় বা ঘাড়ে লাগেনি। আহত হলেও ওটাকে বধ করতে পারেনি উপালী।

উপালী দাঁড়িয়ে একা একাই হেসে ওঠে।

আকস্মিক ভাবে তার জীবনের পথ সে দেখতে পেয়েছে। হিংস্র যে হিংস্রতা দিয়েই তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

বাকী জীবনের কর্মপ্রেরণার আলো পেয়েছে উপালী। ও নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে নেকড়ের মত মানুষ যারা, তাদের দেখে ভয় পেলে তারা থাবা মারে। তাদের হিংস্রতা দিয়েই জয় করতে হয়।

মনে মনে এক স্থির প্রতিজ্ঞায় আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে ও।

আরও বলিষ্ঠ, আরও হিংস্র, আরও ভয়ঙ্কর হবে সে। তাকে হতেই হবে। এ ছাড়া তার অন্য পথ নেই।

হাত দুটো দোলাতে দোলাতে বালুকাতীরে চলতে চলতে অস্থির হয়ে ওঠে উপালী। আর দেরী নয়। কাল থেকেই তার কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে। এ কর্মপন্থা বড় ভয়াবহ। সে জানে, তাকে বাঘের চেয়েও বেশী নৃশংস হতে হবে, ভয়ঙ্কর হতে হবে।

এর পর উপালীর ভয়াবহ কর্মের কাহিনী বলবার আগে এ কাহিনীর গোড়াটুকু না বললে কিছুই বোঝা যাবে না। তাই গোড়ার কথাটুকু শোনাই এবার।

অতীতে গঙ্গার উত্তর তীরস্থ বিশাল জনপদ বৈশালীতে বিরূঢ়ক নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করত। তার পঞ্চভূমিক প্রাসাদটি জনপদের দক্ষিণ প্রাকারের প্রান্তে নির্জন নীল আকাশের নীচে বড় মনোরম মনে হোত। যে পথিকই এখান দিয়ে যেত, সে একবার এই উচ্চ পীঠিকার মত প্রাসাদটির দিকে একটু সময়ের জন্যও অন্তত তাকিয়ে থাকত।

তার আর একটি কারণও হয়তো বা ছিল। শ্রেষ্ঠীর একমাত্র কন্যা পটাচারাকে অনেক সময়ই দেখা যেত অলিন্দে একটি স্তম্ভে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। পটাচারা রূপবতী, রক্তাধরা, চঞ্চলাক্ষী।

আজও সে দাঁড়িয়েছিল। তার আপীন পয়োধরের ওপর নীল কাঁচুলি, তার ওপর হলুদ রঙের সূত্রজালিক। তার বিলোল

কটাক্ষে থমকে দাঁড়িয়ে গেল উপালী, উপালী ক্রীতদাস। শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদের দুটি ক্রীতদাসের ভেতর সবচেয়ে উন্নতদেহী, সবচেয়ে শক্তিমান। উপালীর টানা-টানা চোখ দুটো ঈষৎ আরক্তিম। রাত্রে মাঝে মাঝে তার সুরা পান অভ্যাস আছে। নগরের নিকৃষ্ট মদিরা গৃহে তাকে দেখা যায়। সে রাত্রে সে আর কিছু আহার করে না। এসে শুয়ে পড়ে প্রাসাদের নিম্নভূমিতে ক্রীতদাসের শোবার ঘরে। সবাই ঠিক বুঝতে পারে না। সকলে জানেও না। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠী বিরূঢ়ক তো জানেই না। জানে শুধু পটাচারা।

শ্রেষ্ঠী বিরূঢ়কের পুত্র নেই। একমাত্র কন্যা পটাচারা। যৌবনে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় ধৈর্যে বিরূঢ়ক ধীরে ধীরে প্রায় আঠারটি গুড়যন্ত্র স্থাপন করেছে। তার মালিক সে একা। আঠারটি গুড়যন্ত্রে যা চিনি তৈরী হয়, তাতে শুধু বৈশালীর নয়, সমগ্র লিচ্ছবি রাজ্যের চিনির অভাব মেটায় বিরূঢ়ক। দাম সম্বন্ধে সে অত্যন্ত লোভীর মত লাভ করতে কোন দিনই চায়নি, তাই লিচ্ছবিরাজ তার ব্যবসায়ে কোন ব্যাঘাত তো করেনই না, বরং শ্রেষ্ঠী সম্মেলনে তাকে উচ্চ সম্মান দিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম বিরূঢ়ক ও তার স্ত্রী গৌতমীর খুবই মনোকষ্ট হোত একটি পুত্রের অভাবে। অবশেষে সেই মনোকষ্টের দরুণই হয়তো বা বিরূঢ়ক ভিক্ষুসঙ্ঘে গিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ করল। ভগবান তথাগতের শরণ নিয়ে সে প্রাণিহত্যা, চৌর্য, মিথ্যা, সুরা ও মৃষাবাদ থেকে বিরত হয়ে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হোল। কখনো সখনো বিহারের উপাস্থানশালায় গিয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতো। বিরূঢ়ক তাই বৈশালীর সবচেয়ে ধার্মিক শ্রেষ্ঠী।

পটাচারাকে পুত্রের মত পালন করতো বিরূঢ়ক। পটাচারা যা বলত, তাই হোত। যা চাইত, তাই পেত। অত্যন্ত আবদারে পটাচারা হোল যেমন অভিমানী, তেমনি খামখেয়ালী। তার খেয়াল হোল একবার দুইশত রৌপ্যকাহন দিয়ে একটি সপ্তস্বরা

কিনবে বাজাবার জন্যে। এমন সপ্তস্বরা বোধকরি লিচ্ছবির রাজকন্যার গৃহেও আছে কিনা সন্দেহ। তাই হোল, বিরূঢ়ক দুশ' রৌপ্যকাহন দিয়ে সপ্তস্বরা তৈরী করালেন মেয়ের জন্য। সে সপ্তস্বরার প্রতিটি ঘাটে ঘাটে তিনচার তোলা সোনার একটি করে পাত মোড়া। সপ্তস্বরা বাজান শিখল পটাচারা। কিন্তু কি খেয়াল হোল, হঠাৎ একেবারে বাজান বন্ধ করে দিলে। সপ্তস্বরা তোলা রইল।

গৌতমী মাঝে মাঝে মেয়ের খামখেয়ালীপনার জন্যে রাগারাগি করতেন। বলতেন বিরূঢ়ককে,—আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটির মাথা খেয়ে দিলে তুমি। এ মেয়ে তোমাকে শেষ করবে।

বিরূঢ়ক হাসত, বলত,—শাস্তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে তো নিজের সবই শেষ করে দিয়েছি। পটাচারা আর কি শেষ করবে আমার?

গৌতমী আরও রাগত,—হাসি নয়। মেয়েমানুষের এত জেদ ভাল নয়। মেয়ে তোমার বড্ড বেশী জেদি।

বিরূঢ়ক বলত,—জেদ জিনিসটা খুব খারাপ নয়। আমারও অল্প বয়সে খুব জেদ ছিল, তাই তো এত হাজার হাজার কাহন রোজগার করতে পেরেছি। তাছাড়া মেয়ে কি আমার একার, মেয়ে তোমার নয়?

—আমি শাসন করলে তো তুমি রেগে যাবে।

—রাগব না। তুমি প্রয়োজন হলে শাসন কোরো। তবে অনর্থক শাস্তি দিও না।

—ছাই করব। ও শাসনের বাইরে চলে গেছে।

—তবে বাইরেই যেতে দাও। ভগবান তথাগতের যা ইচ্ছে তাই হবে।

গৌতমী আর কথা বলে না। হঠাৎ একটি দাসীকে ডেকে জ্বালানি কাঠ না তোলবার জন্যে ভীষণ বকতে শুরু করে। বিরূঢ়ক

বোঝে পটাচারার ওপর রাগটা দাসীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে সরে যায়।

এমনি করে বড় হয়ে উঠেছে পটাচারা। নিজের ইচ্ছেকেই সংসারে সবচেয়ে বড় করে দেখেছে। এত বড় করে দেখেছে যে তার প্রবল ইচ্ছার বেগের কাছে আর সব কিছু সে চুরমার করে ফেলতেও বোধহয় দ্বিধা করেনি।

এইটেই হোল তার জীবনের পরবর্তী অনেক অভাবনীয় ঘটনার মূল।

সেদিন অলিন্দে দাঁড়িয়ে সে ইসারায় ডাকল উপালীকে। উপালীর হাতে কয়েকটি উপাধানের ময়লা আস্তরণ। বোধহয় পরিষ্কার করতে নিয়ে যাচ্ছিল। পটাচারাব কটাক্ষের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল উপালী।

তখন নির্জন দুপুব। গোতমী বিশ্রাম করছে। বিরূঢ়ক বেরিয়েছে কর্মস্থানে। দাসদাসী কেউ বা বিশ্রাম করছে, কেউ বা বৈকালের কাজ আগে সেরে রাখতে ব্যস্ত।

তখন গ্রীষ্মকাল। প্রখর রৌদ্রের তাপে পথে একটি পথিকও দেখা যাচ্ছে না। দুরন্ত গবমে এ সময়ে কেউই ঘরের বাইরে আসে না। দেখা যায় শুধু মনিব-হীন দু চারটি কুকুর আর গাছের ডালে বা অলিন্দের আলিসায় দু একটি কাক।

পথের ধারে গভীর পয়োনালা থেকে ঠাণ্ডা জল খাচ্ছে একটা কুকুর।

ওপাশেই অবশ্য রয়েছে একটি জলসত্র। জলসত্রের প্রপাপালিকা ছোট একটি কুটিরের সামনে বসে আছে কোন তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত পথিকের আশায়। বিদেশী পথিক ছাড়া এদেশের কেউ এ সময়ে পথে বেরোয় না। তবু পথের ধারে ধারে জলসত্র আছে।

এ জলসত্র মানুষের জন্য। তৃষ্ণার্ত কুকুরের জন্য নয়। তাই কুকুরটা পয়োনালার জলে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল পটাচারা।

পটাচারার দীর্ঘায়ত চোখ দুটি নেচে উঠেছিল কিসের এক আনন্দে। আনন্দটা হয়তো বা কোন কারণবিহীন। এমন বিনা কারণেও পটাচারা অনেক সময় উল্লসিত হয়ে ওঠে। খিল খিল করে হেসে ওঠে আপন মনে। এটা ওর স্বভাব।

উপালী অপেক্ষা করে।

পটাচারা তাকে দাঁড়াতে ইসারা করেছে। এ হুকুম অমান্য করার সাধ্য কার। এ বাড়ির প্রতিটি দাসদাসী শ্রেষ্ঠীকন্যাকে ভয় করে। ভয় করে তার খেয়ালকে। কখন যে তার কি খেয়াল হবে, কেউ বলতে পারে না। অমান্য করলে সে দাসী বা দাসের বরাতে দুঃখ আছে। হয়ত বা পটাচারা নিজেই হাতের কাছে যা পেল, তাই নিয়ে মেরে বসল। একটি ক্রীতদাসকে একদিন সন্ধ্যায় পটাচারা ভীষণ শাস্তি দিয়েছিল। তাকে দাঁড়াতে বলেছিল, সে বেচারা দাঁড়িয়েছিল। পটাচারা তার ঘাঘরা পরিবর্তন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠায় ক্রীতদাসটি একটু হেসেছিল।

রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল পটাচারা। ডেকে পাঠাল উপালীকে।

হুকুম করল,—বাঁধো এই জানোয়ারটাকে।

উপালী অলিন্দের একটি স্তম্ভের সঙ্গে তাকে বাঁধল। তারপর হুকুম হোল প্রহারের। নিদারুণ প্রহার। আরও! আরও! ক্রীতদাসটি তখন জ্ঞান হারিয়েছে।

তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হোল। ক্রীতদাসটির কিছু বলবার নেই। সে ক্রীতদাস, তার জীবন কেনা।

বিরূঢ়ক এসে শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলো। পটাচারাকে ভর্ৎসনা করলো।

বিরূঢ়ক পঞ্চশীলের সাধক। সে এই ধরনের কাজ সমর্থন করতে পারে না।

তবু পটাচারা নির্বিকার। বাবাকে জানিয়ে দিল—তার অবাধ্য হলে এই রকম হবে।

বিরূঢ়ক বিরক্ত হলো, ক্ষুব্ধ হোল। ক্রীতদাসটিকে ডেকে পাঁচটি রৌপ্যকাহন দিল।

কি আর করবে বিরূঢ়ক। আদরের কন্যা। তাই দাসদাসীদের ডেকে সবাইকে পটাচারার আদেশ যথাসাধ্য পালন করতে বলে দিল।

পটাচারা যখন শুনল, বাবা ক্রীতদাসটিকে পাঁচটি কাহন দিয়েছে। সে উপালীকে ডেকে তার নিদারুণ প্রহারে খুশি হয়ে তাকে বিশটি রৌপ্যকাহন দিল।

উপালী সেইরাত্রেই চলে গেল মদিরাগৃহে। সঙ্গে যাকে মেরেছিল, তাকেও নিয়ে গেল। তাকে মদিরা পান করাবে—আর এই বলে ক্ষমা চাইবে যে সে হুকুম পালন করেছে মাত্র। তার কোন দোষ নেই।

উপালী শক্তিমান। মানুষটি ভাল। একমাত্র উপালী এ বাড়ির কাউকেই ভয় করে না। পটাচারাকেও সময় সময় ভয় করে না।

পটাচারা এক দাসীর কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে উপালী সেই দাসটিকে নিয়ে মদিরাগৃহে গেছে। পরদিন আহারের পর ডেকে পাঠালে উপালীকে নিজের ঘরে।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে তাকাল উপালীর দিকে।

উপালী দেখল পটাচারার উন্নত বুকের ওপর হরিৎকঞ্চুলী আরও উন্নত হয়ে উঠেছে রাগে অহঙ্কারে।

—তুমি কাল মদিরাগৃহে গিয়েছিলে ?

উপালী চোখ নামায়। অকম্পিত সহজ স্বরে বলে—হ্যাঁ ভদ্রে !

—তোমার সঙ্গে আর কে গিয়েছিল ?

—কিম্বিল।

কিম্বিল ওই দাসটির নাম।

—ওকে সঙ্গে নিয়েছিলে কেন ?

উপালী বলে—দাসদের মদিরাগৃহের বার্তা শ্রেষ্ঠীকন্যার জানতে চাওয়া কি শোভন হবে ?

পটাচারা ভাল করে তাকায় উপালীর দিকে। না, তার মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন নেই।

—তোমার কাছ থেকে কি আমায় শোভনতা শিখতে হবে ?—পটাচারার কণ্ঠে শ্লেষ।

উপালী সহজ স্বরে বলে,—আপনি আমার কথা একটু ভুল বুঝেছেন। কিম্বিলকে মদিরাগৃহে নিয়ে গিয়েছিলাম স্ফুর্তি করতে। সে স্ফুর্তির ব্যাখ্যা আপনার কাছে আমার না করাই ভাল।

পটাচারার জেদ বাড়ে,—আমি শুনব তুমি বলো।

উপালী তাকায় পটাচারার দিকে। মনে মনে হাসি পায় ওর।—আপনার কৌতূহল সংযত করলেই ভাল করতেন ভদ্রে। শুনতে যখন চাইছেন বলি, কিম্বিলকে দু চষক মদিরা খাওয়াতেই ওর জ্ঞান ছিল না। ওকে নিয়ে মদিরাগৃহে এক কিঙ্করী তামাসা করতে শুরু করলো।

পটাচারার চোখদুটি নরম হয়ে আসে। উপালীর সুগঠিত শরীরের দিকে তাকায় বারবার। সুমিষ্ট স্বরে বলে,—তুমি ক' চষক খেলে উপালী ?

—আমি ?—একটু হাসে উপালী—আমি খেয়েছিলাম আট চষক। ওতে আমার বিশেষ কিছু হয়নি। আমিই কিঙ্করীটিকে শিখিয়ে কিম্বিলকে নিয়ে আমোদ করছিলাম।

—তারপর কি হোল ?

—আর শুনতে চাইবেন না, ভদ্রে।

—বলো তুমি, নির্ভয়ে বলো।

—কিঙ্করীটি নৃত্য জানত, তাকে দশটি তাম্রকাহন দিয়ে নৃত্য করিয়েছিলাম। কিম্বিলও ওর সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগলো। তারপর—।

উপালী হাসতে লাগল।

পটাচারা বলল,—হাসছ যে, তারপর কি হোল ?

—তারপর আর বলতে পারব না।

—বলো, তোমার কোন ভয় নেই।

—তারপর কিঙ্করীটি কিম্বিলকে বিবস্ত্র করে ফেলেছিল।

পটাচারা হেসে উঠল।—ঠিক হয়েছে। তুমি ওকে শাস্তি দিয়েছ। এই নাও, তোমাকে আমি আরও পাঁচ কাহন দিচ্ছি।

পটাচারা একটি খোদিত কাষ্ঠনির্মিত পেটিকা থেকে আরও পাঁচটি রৌপ্য কাহন বার করে দিল উপালীকে।

উপালী এবারে একটু অবাক না হয়ে পারল না।

উপালী অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছিল পটাচারার ব্যবহার তার সঙ্গে একেবারে অন্যরকম। অন্য কোন দাস বা দাসী মনিবকন্যার কাছে এই ধরনের কথা বলতে সাহস পেতো না। সে নিশ্চিত নিদারুণভাবে প্রহৃত হয়ে বিতাড়িত হোত। কিন্তু পটাচারা তাকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। কেন এ প্রশ্রয় ? ভেবে বিস্মিত হয় উপালী। মাঝে মাঝে এত বেশী প্রশ্রয়ে ভীতও হয়।

পটাচারা বসে ছিল কুট্টিমের ওপর। প্রায় আধশোয়া হয়ে ছিল।

তার বসবার ভঙ্গি অতি মনোরম। যে কোন পুরুষের হৃদয় অস্থির করে তোলবার মত।

উপালীর শরীরও উষ্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

অসামান্য রূপবতী পটাচারা। কণ্ঠে মধু ঢেলে বলে,—তুমি বোস উপালী।

উপালী একটু ইতস্তত করে পাথরের মেঝের ওপর বসে। সোজা হয়ে বসে।

পটাচারা পাতলা ঈষৎ রক্তাভ ঠোঁট দুটি ফাঁক করে একটি হাই তোলে। যেন ঘুম-ঘুম ভাব। চোখ দুটিকে টেনে অতি আরামে বলে,—তোমার গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে উপালী। দুপুরে আমার কাজ থাকে না। ঘুমানর চেয়ে গল্প শোনা ভাল। তোমার বয়েস কত উপালী?

—বয়েস তেইশ কি চব্বিশ হবে।

—আমার আঠার।

তুলনাটা উপালীর ভাল লাগে না। চুপ করে থাকে।

পটাচারা বলে,—তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি খুব মূর্খ নও।

উপালী ম্লান হাসে।—আপনার অনুমান কিছুটা ঠিক।

—তুমি কি শৈশবে পাঠ গ্রহণ করতে?

—হ্যাঁ। তক্ষশীলার বিদ্যালয়েও কিছুকাল ছিলাম।

—তবে তোমার এ অবস্থা কেন?

উপালী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।—ভাগ্যই বলতে পারেন। আমার জন্মের পর আমাদের পুরোহিত গণনা করে বলেছিলেন, আমার ভাগ্য ভাল নয়।

—তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল?

—রোহিনী নদীর তীরে কোলি নগরে। কপিলাবস্তুর ওপারে কোলি নগর। সেখানে আমার বাবা সামান্য অধ্যাপকের কাজ করতেন। আমরা ভাইবোন ছিলাম দশটি। তাই অভাব ছিল বড় বেশী।

—তোমার মা ছিলেন ?

—না। মা মারা গিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন আর সংসারে এক পিসীমা ছিলেন। আমার বাবার মত সরল মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তবে তিনি ছিলেন বড় একরোখা। অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির। আমাদের ওখানে এক শ্রেষ্ঠী আমার বাবাকে বললেন, তাকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হবে, একটি বিচারে। বাবা প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্রেষ্ঠী ছিলেন ওখানকার সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী মানুষ। তিনি রাগলেন। শুধু রাগলেন না, শত্রুতা শুরু করলেন।

উপালী ম্লান হাসে।—জানেন তো ধনীর শত্রুতা কি মারাত্মক হতে পারে। হোলও তাই। বাবার অধ্যাপনার কাজটি গেল। তখন আমি তক্ষশীলায়। খবর পেয়ে তক্ষশীলা থেকে চলে এলাম। এসে সব শুনে বুঝলাম, বাবা না খেয়ে মরলেও শ্রেষ্ঠীর কাছে আর যাবেন না। আমিই গেলাম শ্রেষ্ঠীর কাছে। তাকে অনুনয় করলাম বাবার জন্য। তিনি আমাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাড়িয়ে দিলেন।

উপালী একটু থেমে বলে,—ধনের অহঙ্কার বড় মারাত্মক ভদ্রে।

পটাচারা কৌতূহলে উঠে বসেছে। টানাটানা চোখ দুটোয় ওর সুগভীর সহানুভূতি। উপালীর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—তারপর ?

—তারপর দুঃখের পালা। দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে কাটতে লাগল। বহু চেষ্টা করেও বাবা অন্য একটা জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। নগরে কেউ কোন সাহায্য তো করলই না, বরং নানাভাবে শত্রুতাই করতে লাগল। শ্রেষ্ঠীর দলে সবাই।

বাবাকে বললুম, এ নগর ছেড়ে অন্য কোথাও চলুন। বাবা

পণ করে বললেন,—তিনি ভিটে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। তারপর শুরু হোল দারুণ কষ্টের পালা।

উপালী পটাচারার দিকে তাকায়। চোখ দুটো ওর জ্বলছে।

—একমুঠো তণ্ডুল জোটাতে পারছি না। ভাত না খেয়ে থাকার যে কি কষ্ট, আপনি ধারণা করতে পারবেন না। দিনের পর দিন চোখের সামনে ছোট ভাইবোনগুলো খিদেয় শুকিয়ে যাচ্ছিল। দিনরাত আমার মাথাটা তখন জ্বলত। আগুন জ্বলত সর্বাঙ্গে।

একদিন রাত্রে আমার ছোট বোনটা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেদিন আর সহ্য করতে পারলাম না। বেরিয়ে পড়লাম পথে। সেই রাত্রেই। পথেই রাত কাটল।

পরদিন সকালে নগরের ব্যবসার স্থানে গিয়ে হাজির হলাম। চুরি করব, ডাকাতি করব, যেমন করে পারি আজ আমাকে কিছু নিয়ে যেতেই হবে বাড়িতে। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে চোখ পড়ল আপনাব বাবার দিকে। উনি তখন বাণিজ্যে গিয়েছিলেন ওখানে। সঙ্গে ছিল পাঁচশ গরুর গাড়ি।

মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ওঁকে গিয়ে বললাম,—আপনি কি দাস ক্রয় করবেন ?

উনি জানালেন, ভাল দাস পেলে উনি কিনতে পারেন।

বললাম,—আমাকে কিনুন। বেশী নয় একশ' সুবর্ণ মুদ্রা হলেই আমি রাজী।

উনি রাজী হলেন। উনিশ বছুরে এমন শক্তসমর্থ একটা মানুষ কিনতে আরও বেশী লাগবার কথা।'

আমি বললাম,—সুবর্ণ কিন্তু আমার বাড়িতে পৌছে দেবেন। আমার কথা কিছু বলবেন না।

তিনি সুবর্ণ নিয়ে পৌছে দিলেন। আমি তখন সাবালক, কাজেই দাস-ক্রয়ের ভক্তিতে স্বাক্ষর করলাম।

উপালী থামল। ওর মুখখানা তখনও রক্তাভ। চোখ দুটি সজল।

একটা নিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত হয়ে বলে,—এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম বলুন? তবু জানলাম, একশ' স্বর্ণে ওদের বেশ দীর্ঘদিন কাটবে। ততদিন বাবা কিংবা আর কোন ভাই একটা কিছু করতে পারবে।

পটাচারার চোখ দুটিতে উত্তেজনা।—সেই শ্রেষ্ঠীকে তুমি ক্ষমা করলে উপালী?

উপালীর স্বর অতি গম্ভীর।—না। ক্ষমা করিনি ভদ্রে। তার কথা আজও আমার মনে আছে। বুকের ভেতর জ্বলে যায়। সেই জ্বালা কমাবার জন্যই আমি মদিরাগৃহে যাই। এ জ্বালা কবে যে একেবারে জুড়োবে জানিনে।

পটাচারা তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে উপালীর দিকে।

—তোমার কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি উপালী।

উপালী চমকে ওঠে। পটাচারার তন্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে,—আমি আপনাদের ক্রীতদাস। এ ছাড়া আমার আর কোন পরিচয় নেই।

পটাচারা বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলে—না, তুমি এক আশ্চর্য পুরুষ। সেই জন্যেই বোধহয় এতদিন তোমাকে অন্য দাসের মত করে দেখতে পারিনি। আজ বুঝতে পারছি কেন পারিনি। বাবাও তোমার খুব প্রশংসা করেন উপালী।

নির্লিপ্ত ভগ্নকণ্ঠে উপালী বলে—সেটা তাঁর দয়া। আমি জানি, আমি এখন এক নির্গুণ ক্রীতদাস মাত্র।

হেলে পড়া সূর্যের বিষণ্ণ আভায় উপালীর মুখখানি আরও বিষণ্ণ মনে হয়।

পটাচারা বলে,—আমার একটা কথা রাখবে উপালী?

উপালী বলে,—আপনি যা হুকুম করবেন, শুনতে আমি বাধ্য।

পটাচারা বলে,—এ আমার হুকুম নয়, আমার অনুরোধ, তুমি আর মদিরা পান কোর না।

উপালী চুপ করে থাকে।

—আমি জানি, তোমার কষ্টের কথা মনে পড়লে তুমি স্থির থাকতে পারো না। তোমার জ্বালার কথা আমি বুঝি।

উপালী নীরব।

—তোমার জ্বালা যখন অসহ্য হবে, তখন তুমি আমার কাছে এসো। আমি বেদনার অংশ নেব।

উপালী চমকে ওঠে আর একবার।—এ আপনি কি বলছেন ভদ্রে!

—ঠিকই বলছি। তুমি আর মদিরাগৃহে যেও না। বলো যাবে না?

উপালী চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর অনেক চিন্তার পর বলে,—আমাকে চল্লিশ দিন সময় দিন। তারপর আমি আপনাকে জানাব। এখন আমি উঠি। কাজের সময় হোল।

উপালী চলে যায়।

পটাচারা তেমনি বসে থাকে। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে। কি আশ্চর্য পুরুষ এই উপালী!

আজ চল্লিশ দিন। আবার অলিন্দের স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিপ্রহরে উপালীকে ডেকেছে পটাচারা। উপালী দাঁড়িয়ে আছে।

উপালী ভাবছে। ভাবছে, এই চল্লিশ দিন সময় সে যে কারণে নিয়েছিল, তা কি সে জানতে পেরেছে। সে কি জানতে পেরেছে যে পটাচারা তার জ্বালা উপশম করতে সত্যিই পারবে কিনা?

আভাস সে পেয়েছে। এই চল্লিশ দিনে অনেক আভাস পেয়েছে।

পটাচারা বার বার তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, বার বার তার সঙ্গে

অকারণ কথা বলেছে, হেসেছে। এত বেশী কথা বলেছে, এমন অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়েছে যে দাস মহলেও এ নিয়ে একটু কানাকানি শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিরূঢ়ক বা গৌতমীর কানে অবশ্য কিছু যায়নি। তারা এদিকে এতটা নজরও দেয়নি। তাদের বয়েস হয়ে এসেছে, নিজেদের কাজে নিজেরা ব্যস্ত। বাকী সময়টুকু ভগবান তথাগতের চিন্তায় কাটিয়ে দেয়। বিশেষ করে বিরূঢ়ক ক্রমশই সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ছে। বেশীরভাগ সময়ই সে চৈত্যে শ্রমণ-ভিক্ষুদের সঙ্গে কাটাতে চায়। নিজে একটি বিহার তৈরী করে দেবে বলে বাসনাও আছে। যেমন করেছেন অনাথপিণ্ডদ চুয়ান্ন কোটি স্বুবর্ণ ব্যয়ে একটি অতি মনোরম বিহার।

অত ধন ব্যয় না করতে পারলেও তার বেশ মোটা অঙ্কের স্বুবর্ণ ব্যয় করবার ইচ্ছা রয়েছে। পটাচারার যৌবন সম্বন্ধেও হয়তো বা তার চৈতন্য হোত না, যদি না গৌতমী একদিন মনে করিয়ে দিতেন যে কন্যা সুপাত্রে দান করবার সময় এসেছে।

বিরূঢ়কের চৈতন্য হোল। সে পাত্রের সন্ধান শুরু করলো। দু'একটি সন্ধান যে মিলছিল না, তা নয়। তবে পাত্রের কুলশীল সম্বন্ধে বিবেচনা করতে করতে সময় কাটছিল।

পটাচারা এই সময়টাতেই উপালীকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে চললো। উপালী তাকে মুগ্ধ করেছে। এখন বুঝতে পারছে পটাচারা যে, অনেক আগে থেকেই সে উপালীর প্রতি আসক্ত। সম্প্রতি তার প্রকাশ হয়েছে মাত্র। পটাচারা যে একটি ক্রীতদাসের সঙ্গে তার আসক্ত হওয়ার কলঙ্কের কথা একবারও ভাবেনি তা নয়। হয়তো বা এতে জীবনে অত্যন্ত গুরুতর কিছুও ঘটতে পারে, তবু সে নিজেকে সংযত করতে পারছে না। দিন যত যাচ্ছে, ততই তার বেশী করে ভাল লাগছে উপালীকে। সংযম অভ্যাস সে শৈশব থেকে করেনি, কাজেই সংযম তার পক্ষে

অসম্ভব। দিন দিন তার আবেগ আগুনের শিখার মত বেড়ে উঠছে।

উপালী কিন্তু সংযত। জীবনের সঙ্গে তার সত্যিকারের পরিচয় আছে, তাই সে জানে তার পক্ষে [illegible] প্রতি আসক্ত হওয়া শুধু অন্যায় নয়, অত্যন্ত ভয়াবহ। সে নিজেকে অত্যন্ত সংযত করে রেখেছে।

এটা আবার পটাচারার খুব খারাপ লাগে। উপালী সময় সময় তাকে যে উপেক্ষাও করে এটা তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

একদিন সন্ধ্যায় উপালী যখন পিত্তলের দীপদণ্ড রেখে বাতি জ্বালছিল, চন্দনগন্ধী ধূপ দিচ্ছিল ঘরে, পটাচারা ওকে কাছে ডাকল।

উপালী দাঁড়াল।

—আরও কাছে এসো।

উপালী একটু এগোল।

—আরও কাছে।

উপালী কিন্তু আর এগোল না।

পটাচারা রেগে উঠল।—যা বলছি শোনো।

উপালী হাসল একটু। বলল,—বলুন, শুনছি।

পটাচারা নিজেই ওর কাছে এগিয়ে এসে বললে,—একটা কথা মনে পড়ল তাই ডাকলুম।

—কি?

ফিসফিস করে বলে পটাচারা—তুমি যখন দীপ জ্বালছিলে, তখন কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমায়।

উপালী কেঁপে ওঠে। সংযত স্বরেই বলে—মনিবকন্যার কাছ থেকে একজন ক্রীতদাসের এ-ধরনের কথা শোনা অন্যায়।

বলে তৎক্ষণাৎ উপালী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পটাচারা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে একটি প্রস্তর পীঠিকার উপর বসে। মুখটা ম্লান।

উপালী কেবলই বলে, ক্রীতদাস—ক্রীতদাস।

উপালী যে পটাচারার কাছে একটি ক্রীতদাস নয়, এটা কেন সে উপালীকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। চিন্তায় ডুবে যায় পটাচারা।

কোন এক ফাঁকে উপালী আবার ওর ঘরে এসেছে ও টের পায়নি।

—ভদ্রে!

পটাচারা চমকে ওঠে। তাকায়।

উপালী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—আপনি পরমা সুন্দরী। আমার মত সামান্য এক দাসকে এমন করে প্রলোভন দেখাবেন না।

—প্রলোভন!—পটাচারা তেমনি ম্লান মুখে বসে থাকে।

উপালী আরও একটু সময় দাঁড়ায়। পটাচারার মুখ ম্লান দেখলে ওর যে মোটেই ভাল লাগে না। সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে পটাচারার ম্লান মুখটি মনে ভাসে, এটা উপালী অস্বীকার করতে পারে কই? তবু নিজেকে চেপে রেখেছে উপালী।

বলে,—আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করুন।

পটাচারা এই প্রথম গম্ভীর স্বরে বলে,—না, সব অপরাধই আমার। তুমি যাও।

উপালী চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এর পর থেকে পটাচারা উপালীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনি। আজ দ্বিপ্রহরে থামতে ইঙ্গিত করেছে। উপালী দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পটাচারা কোন কথা বলছে না।

অবশেষে উপালী বলে,—কিছু বলবেন?

পটাচারা আস্তে আস্তে টেনে টেনে বলে,—আজ তোমারই তো বলবার কথা।

আজ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়েছে।

পটাচারা ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে—ঘরে এসো।

নীরবে উপালী ঘরের দিকে ওর পেছন পেছন চলে।

পটাচারা ঘরে গিয়ে প্রস্তর-পীঠিকার উপর বসে।

উপালী দাঁড়িয়ে থাকে। পটাচারা কথা বলে না। উপালী লক্ষ্য করে পটাচারা তার কাছ থেকে কিছু শুনতে উৎসুক। উপালী আস্তে আস্তে বলে,—আপনার কথাই মেনে নিলাম।

—কোন্ কথা ?

—মদিরাগৃহে আর আমি যাব না। আপনি কি জানেন, আপনি সেদিন বলবার পর থেকে আর এক দিনও আমি মদিরা-গৃহে যাইনি ?

—জানি।

—কি করে জানলেন, আমি তো আপনাকে বলিনি ?

পটাচারা হাসে। অবোধ্য হাসি।—তোমার সব খবর আমি মনে মনে জানতে পারি।

উপালী এ কথার উত্তর দেয় না।

পটাচারা বলে,—তুমি কিন্তু আমার খবর কিছু জান না।

—কি খবর ?

—তুমি কি জান, বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন ?

—কোথায় ?

—কৌশাম্বির এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে। আমাদের চেয়েও বেশী সম্পদ তাদের। একমাত্র পুত্র।

উপালীর মুখটা মুহূর্তের জন্যে ম্লান হয়ে ওঠে। সে-মনোভাব চেপে সে বলে,—ভালই তো।

পটাচারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে।—তুমি ভাল বলছ উপালী ? তুমি কি জান সে আমার দাসীর চেয়েও কালো।

দীর্ঘাঙ্গী গৌরাঙ্গী পটাচারার দিকে তাকিয়ে উপালী বলে,—তবু সে শ্রেষ্ঠীপুত্র।

—আমি এ বিয়ে করব না উপালী। কিছুতেই নয়।

পটাচারা একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়ে।

উপালী স্থির শান্তভাবে বলে,—যদিও জিজ্ঞেস করবার অধিকার আমার নেই, তবু জিজ্ঞেস করি, আপনার আপত্তি কিসের?

পটাচারা বলে,—অধিকার তোমার আছে। আছে। কতবার তোমাকে জানাব যে এ অধিকার তুমি অর্জন করেছ। শোন—

পটাচারার আবেগে উপালী একটু বিচলিত হয়। মুহূর্তের জন্যে একটু আবেগ যে তারও না আসে তা নয়। কিন্তু নিজেকে ধীরে ধীরে সংযত করে নেয় উপালী।

শুধু বলে—কষ্ট হয় ভেবে যে আপনার বিয়ের পর আমি আমার জীবনের একজন পরম শুভাকাঙ্খিনীকে হারাব। আপনার দয়া আমার চিরকাল মনে থাকবে, ভদ্রে।

—দয়া! দয়া! উপালী, দয়া আমি তোমাকে কখনও করিনি।

অধৈর্য হয়ে এগিয়ে আসে পটাচারা। দ্বারের অর্গল বন্ধ করে উপালীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে প্রস্তর-পীঠিকার কাছে। পটাচারা কি ক্ষেপে গেল?

—দয়া তোমাকে আমি করিনি উপালী। তোমার কাছে দয়া চাইছি। তুমি বড় নির্মম উপালী।

উপালী নিজেকে সংযত রেখেই বলে,—অনেক কথা বুঝেও না বোঝবার ভান করতে হয় ভদ্রে।

—না, আর ভানের প্রয়োজন নেই। একি তুমি বোঝনি, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পটাচারা জড়িয়ে ধরে উপালীর দীর্ঘ দেহ।

উপালী ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,—সংযত হোন ভদ্রে। আমাকে একটু ভাবতে দিন।

পটাচারা অনুনয় করে।—তুমি আমাকে বাঁচাও উপালী, এ বিয়ে আমি করতে পারব না।

চিন্তিত মুখে উপালী বলে,—আমি কি করতে পারি, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু ভাবতে দিন। একটু ভাববার সময় দিন।

পটাচারার কণ্ঠ ভেঙে এসেছে বলতে বলতে,—আমি আমার মান সম্ভ্রম সব খুইয়েছি। আমার এত অহঙ্কার, অভিমান সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। তুমি কি বোঝ না উপালী দিনের পর দিন তোমাকে আমি কত গভীরভাবে ভালবেসেছি ? ইচ্ছে হয় তুমি আমায় মেরে ফেল, না হয় আমায় বাঁচাও। অন্য কোথাও বিয়ে হলে আমি নিশ্চয় বাঁচব না। নিশ্চয় জেনো।

পটাচারার বয়েস অল্প, সংসারের অভিজ্ঞতা অল্প। নির্মম সংসারের কঠোর দিকটা ও আজও জানে না। তাই উপালীকেই ওর হয়ে চিন্তা করতে হয়। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে উপালী আস্তে আস্তে বলে,—আমি সবই জানি, সবই বুঝি ভদ্রে। তবু আমায় একটু ভাববার সময় দিন। এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা আমার পক্ষে ঠিক হবে না।

পটাচারার চোখ সজল। একথা নিশ্চিত যে ও উপালীকে সত্যিই ভালবেসেছে। ভালবাসায় ওর অতি উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবও যেন অনেক নরম হয়ে এসেছে। খেয়ালীপনা অনেক কমে এসেছে। কিছুদিন হোল পটাচারা একটু শান্ত হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করেছে উপালী।

গৌতমীও লক্ষ্য করেছে কন্যার ভাবান্তর। ভেবেছে বিয়ের জন্যেই মেয়ের এই ভাবান্তর। বিরূঢ়ককে বলেছে আরও শীঘ্র কোন পাত্রের সন্ধান করতে।

কৌশাম্বির শ্রেষ্ঠীপুত্র। সব দিক দিয়েই পটাচারার উপযুক্ত। শুধু ছেলেটির গায়ের রঙ কালো,—একটু বেশী কালো। তা হোক। তাতে কি আসে যায়।

এখানেই বিবাহ প্রায় স্থির করে ফেললো বিরূঢ়ক।

শুনে পটাচারা অস্থির হয়ে উঠল। এই প্রথম ও বুঝল যে উপালীকে ও কত ভালবাসে। উপালীকে ছেড়ে যাবার কল্পনাও তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপায় কি ?

উপালী উপায় ঠিক করুক। সে অত ভাবতে পারবে না।

সেদিন উপালী চলে যায়। পটাচারা আজ যেন খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে। উপালীকে জানিয়েছে তার সব কথা। আর তার কোন দায়িত্ব নেই।

দিন সাতেক কেটে গেছে। বাড়িতে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে পটাচারার বিবাহে। সবাই বিবাহের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। কৌশাম্বিতেই বিবাহ স্থির হয়েছে। বিবাহের দিনও স্থির হয়েছে। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা সপ্তমীর সন্ধ্যায় বিবাহ। আর দেরী নেই।

বিরূঢ়ক জিনিস কেনায় ব্যস্ত। গৌতমী যা যা খুঁটিনাটি প্রয়োজন বলে দিচ্ছে। বিরূঢ়ক প্রতিদিনই কিছু-কিছু দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে আনছে। বিরূঢ়ক বেশ খরচ করবে এ বিয়েতে।

এত আয়োজন, এত সোরগোল, কিন্তু পটাচারা শান্ত ম্লান। কারুণ্যের প্রতিমূর্তি যেন পটাচারা। ওর এমন পরিবর্তন যেন সত্যিই অভাবনীয়।

উপালী সবই লক্ষ্য করে। ভয়ে পটাচারার কাছে আসে না।

সেদিন রাত্রে উপালী সকলের শেষে শুতে যাচ্ছিল নিজের ঘরে। অলিন্দ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কি ভেবে আবার ফিরল।

পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল পটাচারার ঘরের দিকে। ঘরের কাছে এসে থামল। দ্বারের স্বল্প ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরে পিত্তলদণ্ডের ওপর তখন দীপবর্তিকা জ্বলছে। দীপের আলো

ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ক্ষীণ আলোয় ও দেখে পটাচারা গালে হাত দিয়ে বিষণ্ণ মনে বসে আছে কুট্টিমের ওপর।

উপালীর বুকের ভেতরে একটা ভীষণ আলোড়ন আনে ওই দৃশ্য। ও আজ আবেগে এই প্রথম অস্থির হয়ে ওঠে।

খুব আস্তে দ্বারে আঘাত করে।

পটাচারা ভেতর থেকে কোন কথা বলে না। আস্তে আস্তে দ্বার খুলে যায়।

আস্তে বলে পটাচারা,—কে?

উপালী ঘরে ঢুকে নিজেই আজ দ্বারের অর্গল দিয়ে দেয়। কপালে ওর চিন্তার রেখা।

পটাচারা ধীরে ধীরে ওর সামনে দাঁড়ায়।

উপালী ওর কাঁধ ধরে বলে,—এই শেষ দেখা করতে এলাম। আমি আজ রাত্রেই এখান থেকে পলায়ন করব।

—কেন?

—তুমি চলে গেলে এ প্রাসাদে থাকা আমার সম্ভব হবে না। আমি পলায়ন করব। এ রাজ্যে থাকলে আমাকে প্রহরী ধরবে। ক্রীতদাসের পলায়নের অপরাধে বিচার হবে। তাই স্থির করেছি, শ্রাবস্তীর আলবী নগরে যাব। ও নগরটি আমার জানা আছে। ওখানে আমার এক অতি পরিচিত বন্ধু আছে। তক্ষশীলায় আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

পটাচারা নীরবে ওর দিকে তাকায়।

উপালী বোঝে। বিষণ্ণ মুখে বলে,—তুমি বিয়ে করে সুখী হও পটাচারা।

এই প্রথম উপালী ওর নাম ধরে ডাকল।

পটাচারা হাসে।—তুমি কি মনে কর, আমার মন বলে কিছু নেই?

—আছে। কিন্তু মনকে তো মানানো যায়।

—কোন কোন ক্ষেত্রে মানানো যায় না।

—তবে—। উপালী একটু চিন্তিত হয়।

পটাচারা কান্নার চেয়েও বিষণ্ণ হাসে।—তবে আর কিছু নয়। এ বিয়ে আমি মেনে নেব না। বিয়ের আগে একটা কিছু আমাকে করতেই হবে।

উপালী জানে, ও অত্যন্ত জেদী। ভয়ে ভয়ে বলে,—কি করবে?

—হয়তো—পটাচারা একটু সময় থেমে বলে,—হয়তো আমার মৃতদেহ দেখতে পাবে বিয়ের আগের দিন।

চমকে ওঠে উপালী। বলে ওঠে,—ছি, ওসব কথা কখনও মনেও এনো না। আমি কি্ করলে তুমি সুখী হও বলো?

পটাচারা একটু সময় ভাবে। আস্তে আস্তে বলে,—আমি যা বলব শুনবে?

—সত্যি শুনব।

—তবে শোন, আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।

আরেকবার ভীষণভাবে চমকে ওঠে উপালী।—আমার সঙ্গে! কোথায়?

—তুমি যেখানে যাবে, সেখানে।—পটাচারার কণ্ঠস্বর অবিচলিত।

—কিন্তু—

—কিন্তু কি উপালী?

—আমি যাব আলবীতে পালিয়ে। তুমিও আমার সঙ্গে পালাবে?

—হ্যাঁ, তাই যাব।

—আমি তো ধনী নই পটাচারা। আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব কি?

একটু চিন্তা করে পটাচারা বলে,—এখান থেকে যা নিয়ে যাব, তাতে বেশ কিছুদিন চলে যাবে।

বিশেষ চিন্তিত উপালীর মুখ।—কিন্তু তারপর ?

—তার পর তুমি কি একটা কিছু করতে পারবে না ?

—নতুন জায়গায় গিয়ে কি করতে পারব এখান থেকে তো বলতে পারিনে। কি-ই বা করব ?

—ব্যবসা কিছু করতে পার। পরে হয়ত তুমিই একজন শ্রেষ্ঠী হতে পারবে।

পটাচারা হাসে। উপালীও হাসে।

রাত গভীর হয়ে আসছে। প্রাসাদ নির্জন। বাইরে অন্ধকার। কৃষ্ণা দশমীর রাত। আকাশটাও যেন নিকষ কালো। উজ্জ্বল তারাগুলো না থাকলে বোঝাই যেত না যে, আকাশ আছে।

পথে কেউ নেই। শুধু মাঝে মাঝে মাঝে প্রহরীর চৌকির হাঁক শোনা যাচ্ছে।

প্রহরীর হাঁক শুনে পটাচারা বলে,—পথে যদি আমাদের ধরে ফেলে ?

উপালী বলে,—সে ভার আমার। অর্থ উৎকোচ দিয়ে বশ করতে হবে প্রহরীদের। লিচ্ছবি রাজ্যের সীমানার ধারে আবার হয়তো ধরবে। তখনও ওই একই ব্যবস্থা করতে হবে।

—কিসে যাবে ?

উপালী ভাবতে ভাবতে বলে,—সে সব ব্যবস্থা আমি করব। তুমি কাল শরীর অসুস্থ বলে শুয়ে থাকবে। দুপুরের দিকেই আমরা বেরোব। তাহলে অনেকটা পথ যেতে পারব সন্ধ্যার ভেতর। তারপর সন্ধ্যার পরে যদি চৌকিতে খবর যায়, আমাদের ধরতে পারবে না। রাত্রের অন্ধকারে কোন প্রহরীই আমাদের খোঁজ পাবে না। ভোরের দিকে আমরা এ রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারব। অচিরবতী নদী পেরিয়ে কোশল রাজ্যের ভেতর পৌঁছাব।

পটাচারা বলে,—শ্রাবস্তী থেকে কতদূর সে জায়গা ?

উপালী একটু ভেবে বলে,—প্রায় পঁয়ত্রিশ যোজন। তখন নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে। ওদিককার পথঘাট আমি কিছু কিছু চিনি।

পটাচারা উপালীর হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলে,—লিচ্ছবিরাজের তরফ থেকে যদি কোশলরাজকে খবর পাঠায় আমাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে ?

উপালী হাসে,—অসম্ভব। কোশলরাজ প্রসেনজিতের সঙ্গে লিচ্ছবিরাজের শত্রুতা আছে। তারা সে খবর গ্রাহ্য করবে না। এরাও হয়তো খবর দেবে না।

উপালী এবার পটাচারার কোমল পৃষ্ঠদেশের দিকে জড়িয়ে ধরে বলে,—এবার আমি যাই, পটাচারা। কাল প্রস্তুত থেকো।

হঠাৎ পটাচারা ওর বিশাল বক্ষে মুখ রেখে বলে,—আমার যেন একটু ভয় ভয় করছে।

বক্ষ আরও বিস্তৃত করে উপালী,—ভয় কি? আমি তো আছি!

আস্তে আস্তে পটাচারার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে আসে উপালী। সে রাত্রে উপালীর ঘুম হয় না। পটাচারারও ঘুম হয় না। •

পরদিন সন্ধ্যার আগেই অচিরবতী নদীর তীরে এসে থামল উপালী। উপালী নিজেই গরুর গাড়ি চালাচ্ছিল। অত্যন্ত জোয়ান দুটো বলদ বেছে নিয়েছিল উপালী। খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে তারা! গাড়ির আবরণের ভেতর পটাচারা বসে আছে।

এতক্ষণে গাড়ি থামাল উপালী।

ভেতরে পটাচারা চমকে উঠল, কিছু বিপদ হোল নাকি?

সমস্ত পথটাই পটাচারা ভয়ে ভয়ে আসছিল। ভগবান তথাগতের শরণ নিয়েছিল পটাচারা। জীবনে এই প্রথম সে বুদ্ধের কথা স্মরণ করল। ভগবান দশবলের বরাভয় শোভিত হাতখানি চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিল পটাচারা।

এতক্ষণ মন শান্ত ছিল। পথে কোন বিপদ হয়নি। পথ চলতে চলতে একবারও থামেনি উপালী। পটাচারা বাইরে মুখ বাড়িয়ে একটা কথাও বলেনি ওর সঙ্গে। উপালীর বারণ ছিল।

এখন হঠাৎ গাড়ি থামতে চমকে উঠল পটাচারা।

উপালী আবরণের ভেতর মুখ বাড়াল। বলল,—অচিরবতী তীরে এসেছি। তুমি নামবে?

আশ্বস্ত হোল পটাচারা। মুখে হাসি ফুটল।—লিচ্ছবি রাজ্য পার হয়ে এসেছি?

হেসে বলে উপালী,—হ্যাঁ। তুমি নেমে এসো।

এতক্ষণে গাড়ি থেকে নামে পটাচারা।

নির্জন নদীতীরে জনমানবের সাড়া নেই। নদীর পশ্চিম প্রান্তে সূর্য নেমেছে। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। তীরভূমি বহু যোজন বিস্তারিত। নদীর ওপারে শ্রাবস্তীর আবছা ছায়া চোখে পড়ে। ঘন সবুজ বৃক্ষাস্তীর্ণ ওপারে দু একটি বিহারের সুউচ্চ চূড়া চোখে পড়ে। চূড়াগুলি রৌদ্রের শেষ আভায় যেন জ্বলছে। ওর ভেতর কয়েকটি চূড়া বোধহয় সুবর্ণ নির্মিত। শান্ত নম্র শ্রাবস্তীকে অচিরবতীর এ তীর থেকে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল।

পটাচারা কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

উপালী ওর পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে কি যেন খোঁজে।

আস্তে বলে পটাচারা,—কি দেখছ?

—দেখছি, কোথাও আশ্রয় মেলে কিনা।

উপালীর সন্ধানী চোখ এক জায়গায় নিবদ্ধ হয়।

—ওদিকে যেন কয়েকটি কুটির চোখে পড়ছে ?

পটাচারা লক্ষ্য করে বলে,—হ্যাঁ।

উপালী বলে,—চলো, ওদিকেই আমাদের যেতে হবে। কোথাও আশ্রয় নিতে হবে রাত্রির জন্যে। নদীতীর খুব নিরাপদ নয়। দস্যুর উপদ্রব থাকতে পারে।

পটাচারা এবারে একটু ভয় পায়।—তাই চলো। একটু নদীর ধারে চলো। হাত মুখ ধুয়ে নিই। মাথাটা যেন জ্বলছে।

বাইরের রৌদ্রে অনভ্যস্ত পটাচারার কষ্ট হয়েছে। মুখখানি ওর ক্লান্তিতে শুকিয়ে গেছে।

উপালী ওকে নিয়ে নদীর ধারে যায়। স্রোতের জলে হাত মুখ ধুয়ে নেয় ওরা। ঠাণ্ডা শীতল জল। বেশ আরাম লাগে।

উপালী হেসে বলে,—যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি আমার কে ? কি বলবে ?

পটাচারা একটু লজ্জিত মুখে হেসে বলে,—বলব স্বামী।

—যদি বলে কোথা থেকে আসছ ?

—বলব বাপের বাড়ি থেকে।

উপালী বলে,—না। বলবে মহামারীর জন্যে দেশ ছেড়ে চলে এসেছি। লিচ্ছবি রাজ্যে মধ্যে মধ্যে মহামারী হয়। বৈশালীর নাম কোর না যেন। বলবে বৈশালীর কাছে মহাবনের প্রান্তে আমরা থাকতাম। আমি ছিলাম সেখানকার অরণ্য-রক্ষণ-সচিব। কাজ ছেড়ে চলে এসেছি অন্য কোন কর্মের আশায়।

পটাচারা হাসে।—তুমি এত বানিয়ে বলতে পার !

উপালীও হাসে।—উপায় নেই। সত্যি কথা বললে বিপদে পড়তে হবে।

পটাচারা নদীর জলে অনেকক্ষণ ধরে মুখ ধোয়।

উপালী তাড়া দেয়।—চলো, আর দেরী কোর না। সন্ধ্যা হয়ে এলো।

পটাচারা উঠে আসে।

আবার গরুর গাড়ি চালায় উপালী পূর্বদৃষ্ট কুটিরের দিকে।

দেখতে দেখতে ওরা কুটিরের কাছে এসে পড়ে।

উপালী নামে। পটাচারাকে নামতে বারণ করে। এগিয়ে আসে একটি কুটিরের দিকে।

দেখে সামনে এক বৃদ্ধা বসে আছে।

এটি একটি জলসত্র বা প্রপা। প্রপাপালিকা এই বৃদ্ধা।

উপালী কাছে আসে।

বৃদ্ধা ভাল করে নজর করে তাকে দেখে।

—কি চাই বাছা? জল চাই?

উপালী বলে,—না, একটু আশ্রয় চাই মা।

বৃদ্ধা আরও ভাল করে ঠাহর করে।—তুমি কি বিদেশী?

—হ্যাঁ।

—কোন্ রাজ্য থেকে আসছ?

—লিচ্ছবি রাজ্য। যাব শ্রাবস্তীতে! বড়ই বিপদে পড়েছি। আর নদী পার হওয়ার কোন উপায় নেই। আপনার কাছে একটু আশ্রয় চাইছি।

বৃদ্ধা তবু সন্দেহের চোখ নিয়ে তাকায়।

—আমি তো থাকি ঐ পাশের কুটিরে। তোমার পরিচয় না পেয়ে আমি কি করে তোমাকে আশ্রয় দিই।

উপালী বোঝে বৃদ্ধা তাকে দস্যু বলে সন্দেহ করছে।

সে বলে,—বেশ, আমি না হয় বাইরে রাত কাটাব। আমার স্ত্রীকে একটু আশ্রয় দিন।

—স্ত্রী! কই সে?

গরুর গাড়ি দেখিয়ে বলে উপালী,—ওই গাড়ির ভেতরে। ছেলেমানুষ, একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

বৃদ্ধা ওঠে।—ওমা, এতক্ষণ তো বলতে হয়।

বৃদ্ধা নিজে গরুর গাড়ির সামনে গিয়ে পটাচারাকে নামিয়ে নিয়ে আসে।

—ও মাগো! কি সুন্দর বউটি! মুখখানি শুকিয়ে গেছে গা! এসো মা, এসো। তোমার নাম কি?

—পটাচারা।

—বাঃ! কি সুন্দর নাম। এসো—

পটাচারা ওর অলঙ্কার ও সুবর্ণের ছোট কাঠের বাক্সটি হাতে নিয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে এগোয়। বৃদ্ধা আগে, তার পেছনে পটাচারা, তার পেছনে উপালী।

কুটিরে ওরা রাত্রির মত আশ্রয় পায়।

কুটিরে গিয়ে উপালী বৃদ্ধার হাতে দুটি রৌপ্য কাহন দিয়ে বলে,—এটা রাখুন।

ও দুটো ফেরত দেয় বৃদ্ধা।—তা কখনও হয়! অতিথির কাছ থেকে মূল্য নেব না। তোমরা আজ আমার অতিথি।

উপালী খুশি হয়।

পটাচারা বৃদ্ধার সরলতায় মুগ্ধ হয়।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে?

পটাচারা উপালীর দিকে লজ্জিত দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বলে,—বছরখানেক।

বৃদ্ধা বলে,—বেশ, বেশ। আমার ছেলে থাকলেও এত বড়টাই হোত। আমার ঘরেও এমন টুকটুকে বউ আসত। কিন্তু এমন হতভাগী আমি, কেউ নেই আমার! কেউ নেই। এই প্রপায় জল পান করে যে যা দু এক কড়া দেয়, তাইতেই খেয়ে বেঁচে আছি। আর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? যম কি আমায় চোখেও দেখে না।

আবার মুগ্ধ হয় পটাচারা বৃদ্ধার সরলতায়।

আলাপে কথায় সন্ধ্যা কাটে। বৃদ্ধা নিজে অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধে। খেয়ে দেয়ে রাতও কাটে।

পরদিন ভোরে উঠে উপালী বাইরে আসে। এইবার যাত্রা করতে হবে।

পটাচারাও উঠে পড়েছে। যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। বৃদ্ধা কিন্তু আপত্তি করে। বার বার বলতে থাকে,—আজ দুপুরে খাওয়া সেরে গেলেই হোত। দুপুরে কচি মেয়ে না খেয়ে থাকবে, এ কেমন কথা বাবা!

উপালী হাসে,—তা হোক। শ্রাবস্তীতে পৌঁছে অতিথিশালায় খাওয়া সেরে নেব।

বৃদ্ধা একটু বিরক্ত হয়।—যা ভাল বোঝ কর বাছা। আজকালকার ছেলে সব। বললে তো শুনবে না?

—আপনি তবে আমার একটা কথা রাখুন—বলে পটাচারা।

—কি?

—এই সুবর্ণটি রেখে দিন। এটি আপনার প্রণামী—বলে পটাচারা সুবর্ণটি বৃদ্ধার হাতে তুলে দেয়।

বৃদ্ধা এবারে গ্রহণ করে। পটাচারার মুখচুম্বন করে বিদায় দেয়।

ওরা গাড়ি নিয়ে যাত্রা করে। গাড়ি নিয়ে তো পার হওয়া যাবে না। তাই খেয়াঘাটে এসে গাড়ি বলদ সমেত বিক্রি করবার চেষ্টা করে উপালী।

সস্তা দর দেখে মাঝিরাই এটি কিনতে রাজী হয়ে যায়। পরিবর্তে ওদের বিনা মূল্যে পার করে দেয়। কিছু রৌপ্যকাহন, তাম্রকাহন-দাম বাবদ দিয়ে দেয়।

নদী পার হয়ে ওদের হেঁটে পথ চলতে হয়। নদী থেকে জনপদের মধ্যস্থল খানিকটা দূর। ওরা একটু সময় জোরে হেঁটে

পৌঁছে যায়। সেখানে জেতবনের ধারে দাঁড়িয়ে উপালী পটাচারাকে অনাথপিণ্ডদের তৈরী মহাবিহার দেখায়। পটাচারা কখনও শ্রাবস্তীতে আসেনি। বিস্ময়ে চারদিক দেখতে থাকে। বৈশালীর চেয়ে অনেক শান্ত, অনেক সুসমভাবে সজ্জিত এই শ্রাবস্তী। পটাচারার বড় ভাল লাগে নগরটি।

পথে-ঘাটে বুদ্ধের প্রতি অনুরাগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। বৈশালীর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় ছোট ছোট চৈত্য এখানে। সুন্দর শীতল পরিবেশ। স্থানে স্থানে অশত্থ বৃক্ষের মনোরম ছায়া। প্রাসাদের আশে পাশে কানন। আম্র কাননের সংখ্যাই বেশী।

অতিথিশালার খোঁজ করে উপালী।

জেতবনের কাছাকাছি একটি অতিথিশালায় এসে থামে ওরা। এটিও বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের দান। জেতবনের বিস্তীর্ণ উদ্যানে সুশীতল বাতাসের ছোঁয়ায় পটাচারা ধীর আনন্দে ভরে ওঠে।

কত শান্ত হয়ে গেছে পটাচারা। কে বলবে যে এই সেই রূপগর্বিতা চঞ্চলা বৈশালীর শ্রেষ্ঠীকন্যা পটাচারা।

অতিথিশালায় একটি গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। সেখানে নিশ্চিন্ত আরামে বসে ওরা দুজন। সাত দিন এখানে থাকা চলে। সপ্তম দিবসে এ অতিথিশালা ত্যাগ করতে হবে।

পটাচারা খুব খুশি।—এখান থেকে আলবী কতদূর ?

উপালী কপালের ঘাম মুছে বলে,—প্রায় পঁয়ত্রিশ যোজন।

—কি করে যাওয়া যাবে অতদূরে ?

—হুঁ। দূর বটে। মধ্যে আবার একটি কান্তার পার হতে হয়। গরুর গাড়ি করেই যেতে হবে।

হঠাৎ পটাচারা উপালীর কোলে একখানি হাত রেখে বলে,—তার চেয়ে আমরা এখানে যদি থাকি ?

উপালী পটাচারার সরল ছেলেমানুষের মত চোখ দুটির দিকে

তাকায়। একটু ভেবে একটু হেসে ওর হাতখানা ধরে বলে,—এখানে কি তোমার খুব ভাল লাগছে?

—খু-উ-ব।

—এখানে খরচ পড়বে কিছু বেশী। আলবী ছোট নগর। শ্রাবস্তীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। তাই এখানে সব জিনিসই একটু দুর্মূল্য।

—তা হোক।

উপালী বলে,—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—তোমার সবই ভেবে দেখি। আমি এখানেই থাকব। তুমি একটি গৃহের সন্ধান কর।

উপালী আবার হাসে।—বেশ তো, তাই-ই করব। তুমি এখনই এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন? তোমার কোন্ জিনিসটি এখানে সবচেয়ে ভাল লাগল?

—জেতবন। আর ওই মহাবিহার। ওখানে উপাস্থানশালায় মাঝে মাঝে যেতে পারব। ভগবান শাস্তার উপদেশ শুনতে পাব।

—এই সেরেছে! তুমি কি বিহার-বাসিনী হবে নাকি শেষে?

উপালীর ঠাট্টায় পটাচারা রাগ করে না। বলে,—মেয়েদের তো থাকতে দেয় না।

—দেয়। অবশ্য জেতবনের বিহারে নয়। তীর্থক আনন্দ ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সেখানে বহু সুবর্ণ দান করেছে অনেক মেয়ে। সবচেয়ে বেশী কে দান করেছে জান?

—কে?

—অম্বপালী। বারবিলাসিনী নর্তকী অম্বপালী। সে এখন ভিক্ষুণী হয়ে অর্হত্ব লাভ করেছে।

—অর্হত্ব লাভ করলে কি হয়?

—আমি ঠিক জানি না। শুনেছি, অর্হত্ব লাভ করলে পূর্ব-জন্মের বৃত্তান্ত জানা যায়।

—আচ্ছা, আমরা পূর্বজন্মে কি ছিলাম?

উপালী হাসে।—পূর্বজন্মে? তুমি আমার স্ত্রী ছিলে এতে সন্দেহ নেই।

পটাচারাও হেসে ওঠে।

উপালী উঠে পড়ে।—তুমি দোর বন্ধ করে বিশ্রাম করো। আমি সব জিনিস কিনে নিয়ে আসি।

পটাচারা কাঠের বাক্স থেকে ওর হাতে রৌপ্যকাহন দেয়, না-গুণে অনেকগুলো।

বাক্স ভর্তি করে এনেছে রৌপ্যকাহন আর স্বুবর্ণ। তাম্রকাহন বা কড়া একটিও নেই। অলঙ্কারও এনেছে প্রচুর। কিছু গায়ে, কিছু ক্ষৌমবস্ত্রে বাঁধা পেটে গোঁজা।

উপালী উঠে বেরিয়ে যায়। পটাচারা দ্বারে অর্গল দিয়ে বেশ পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হয়। সঙ্গে দুটি মোট ছিল। খুব ভারী নয়। উপালীই টেনে এনেছিল। মোট দুটি খোলে পটাচারা।

কাপড়-চোপড় সব গোছাতে হবে। সওদা এলে তাকেই আজ সব কাজ করতে হবে। বসে থাকা চলবে না আর।

এ এক অন্য জীবন। কষ্ট আছে, কিন্তু আনন্দ আছে।

পটাচারা একটা নিঃশ্বাস ফেলে। এতক্ষণে গভীরভাবে মনে পড়ে বাবার কথা। প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছে সে কি এত বড় আঘাত সইতে পারবে? তা হয়তো পারবে। বেশ বুঝতে পারছে পটাচারা, যে বাবার মুখখানি বেদনায় নীল হয়ে যাবে। ভাববে, অনেক ভাববে, তারপর বিহারে ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে বসবে। তাঁদের উপদেশ শুনবে, ভগবান বুদ্ধের শরণ নেবে মনে-প্রাণে। বাবা বাঁচবে। বাবা মরবে না।

কিন্তু মা? মায়ের কথা ভাবতেই আঁতকে ওঠে। মা এ

আঘাত হয়তো সইতেই পারবে না। শয্যা গ্রহণ করবে। আহার ত্যাগ করবে। দিন দিন কৃশ হয়ে উঠবে। হয়তো বা প্রাণত্যাগ করতেও পারে।

পটাচারা তো জানে, সে বাবা মায়ের কত আদরের, কত স্নেহের। কত বড় আঘাত সে দিয়ে এলো তাদের! ও জানে কৌশাম্বির সেই শ্রেষ্ঠীর কাছে বাবার জবাব দেবার কিছু থাকবে না।

হয়তো বলবে, পটাচারা মরে গেছে।

তাই যেন বলে। সে মরেই গেছে। আগের পটাচারা মরে গেছে। উপালীর প্রেমে নতুন পটাচারা জন্ম নিয়েছে। এ মেয়ে অনেক শান্ত, অনেক সহনশীল।

মনে মনে এ কথা স্থির জেনেছে ও যে তাকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হবে। উপালীর সঙ্গে তার জীবন সুখে কাটবে এমন কথা ভাবা ঠিক নয়। বাবার কাছে থাকা আর উপালীর কাছে থাকা অনেক তফাত। এ এক অনিশ্চিত জীবন। অনিশ্চিত পরিবেশের জন্যেই মনকে সে প্রস্তুত করে নিয়েছে।

তবু উপালীকে ছাড়বার কথা সে কল্পনা করতে পারে না।

উপালীকে সে যে কত ভালবেসেছে তা ভগবান জানেন।

পটাচারার চোখ সজল হয়ে আসে।

জিনিস গোছানো আর হয় না। সব যেমন পড়েছিল, তেমনি পড়ে থাকে। অনেকক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে বসে থাকে ও।

বেলা বেড়ে যায়।

উপালী এসে পড়ে। টুকিটাকি কিছু কিছু জিনিস ছাড়াও শয্যার জন্যে পশমের চাদর নিয়ে এসেছে সে। ঘরে ঢুকে সব মোট নামিয়ে ঘাম মোছে উপালী।

এবার গ্রীষ্মের তাপটা বড় বেশী। সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। বার বার ঘাম মুছেও স্বস্তি পায় না উপালী।

পটাচারাকে স্নানাগারে যেতে বলে।

—যাই।—পটাচারা অন্যমনস্ক।

উপালী বলে,—তবে না হয় আমিই যাই আগে। তুমি বড় অবাধ্য।

কথাটা একটু কঠোর ভাবে বলে ফেলেছিল উপালী।

প্রথম দিনেই এমন কর্কশভাবে কথা বলা উপালীর ঠিক হয়নি। কি করবে। রোদে পুড়ে এসে ওর মাথাটা জ্বলছিল। তাই নিজেকে সামলাতে পারেনি।

পটাচারা স্থির নেত্রে তাকায়। এই কি সেই পটাচারা? উপালী কি সেই দাস?

অতি শান্ত গম্ভীর স্বরে পটাচারা বলে,—বেশ আমিই যাই।

বলে ওঠে ও।

উপালী বুঝতে পেরেছে এতক্ষণে যে ও একটু অন্যায় করে ফেলেছে। পটাচারার অবাধ্য হওয়া সেদিনও তার পক্ষে অপরাধ ছিল। আজই এতটা এগিয়ে যাওয়া তার কোনমতেই উচিত নয়।

ও পটাচারার ঘাঘরার প্রান্ত ধরে টানে।

চোখে ভর্ৎসনার ভাব এনে পটাচারা বলে,—ছি! ছাড়ো।

উপালী উঠে ওর সামনে দাঁড়ায়। রোদে পুড়ে মুখখানা ওর কালো হয়ে গেছে। এখন কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে।

—একটা কথা শোন।

পটাচারা গম্ভীর।—এখন কথা শোনবার সময় নেই। অনেক কাজ। আমি স্নান সেরে এলে তবে তুমি যাবে। ততক্ষণে বরং দেখো রন্ধনশালা বন্ধ হয়ে গেল নাকি। আমাদের খাবার তো আনা হয়নি।

সহজ অথচ গম্ভীর স্বরে কথা-ক'টি বলে ও।

উপালী তাকিয়ে থাকে। বোধহয় ভাবে এই কি সেই

পটাচারা? উদ্ধত যৌবনা রক্তাধরা পটাচারা। এই প্রথম উপালীর মনে হয় সে পটাচারার মৃত্যু হয়েছে। সেই পটাচারাকে উপালী পায় নি। সে যাকে পেয়েছে সে নিতান্তই এক সাধারণ স্ত্রী।

আবার ঠকেছে উপালী। বেদনায় মুচড়ে উঠল উপালীর বুক। জীবনভর ওর শুধু ঠকবার পালা। ক্রীতদাসের জীবন থেকে কে জানে ও আরও ভয়াবহ কষ্টের জীবনে নেমে এলো কিনা?

দুটি সুদীর্ঘ বছর কেটে গেছে এরপর। পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও পরিবর্তন হয়েছে। সে পরিবর্তন কারও কাছে দুঃখের, কারও কাছে সুখের।

শ্রাবস্তীর সকলেরই পরিবর্তন হয়েছে। ভিক্ষুদেরও পরিবর্তন হয়। কেউ দশশীল শিক্ষা করতে করতে মার্গসুখ লাভ করে। কেউ বা বিদর্শনা লাভ করে অর্হত্বের দিকে এগিয়ে যায়। কেউ বা সাধারণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সাধনে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে।

স্থির কিছু নেই। স্থির কিছু থাকতে পারে না। বিদর্শনা লাভ করলেই এই সংসারের অনিত্যতার জ্ঞান লাভ করে ভিক্ষুরা। তারা তখন সাংসারিক পরিবর্তনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। জানে এইটেই স্বাভাবিক। এইটেই নিয়ম।

উপালী তো তা বোঝে না। সাধারণ সংসারের মানুষ কেউই বোঝে না।

উপালীর যে পরিবর্তন হয়েছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সত্যিই এতদিনে উপালী বুঝতে পেরেছে ওর ভাগ্য। এ জন্মের মত দুঃখের খাতায় নাম লিখিয়ে এসেছে। এত শোচনীয় দুর্দশা যেন শুধুমাত্র তারই হবে! সংসারে সকলে কি এ দুঃখের অংশ নিয়ে তার দুঃখ লাঘব করতে পারে না?

অংশ একজন নিয়েছে, সে পটাচারা।

এইটেই উপালীর সবচেয়ে বড় বেদনা।

কেন এত অবিচার? কেন এত দুর্ভোগ? সে তো কারও কোন ক্ষতি করেনি! সে তো বেশী কিছু চায়নি! সে চেয়েছিল ছোট একটি গৃহ আর দিনান্তে একমুঠো ভাত। তাতেই পটাচারাকে সে সুখী করতে পারত।

পটাচারার তুলনা নেই। সর্বস্ব ত্যাগ করেছে তার জন্যে। সর্বস্ব দিয়েছে তাকে। তবু পটাচারাকে একটু সুখীও করতে পারল না সে? পটাচারা চেয়েছিল বাঁচতে। শুধু মাত্র উপালীর সঙ্গে বেঁচে থাকতে। বাঁচবার অধিকারও দিল না শ্রাবস্তীর মানুষ?

চোখ দুটো জ্বালা করে। উপালী ব্যর্থ। একেবারে ব্যর্থ। তার জীবনে সফলতা বলে কোন কথা নেই।

শেষ পর্যন্ত সব অলঙ্কার নিয়ে সে ব্যবসা করতে নেমেছিল। পটাচারা সব অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল গা থেকে। একটি কথাও বলেনি। শুধু হেসে বলেছিল তার যাবার সময়,—দেখো যদি কিছু রোজগার করতে পার। বেশী লোভ কোর না। মাসান্তে দশটি রৌপ্যকাহনও যদি পাও আমাদের চলে যাবে। বাড়িটা তো আছে?

হ্যাঁ। বাড়ি একটা আছে। প্রথমেই একটি জায়গা কিনে গৃহ নির্মাণ করেছিল উপালী। ভেবেছিল স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। তখন সে জানত না যে সংসারে উপালীর মত অভাগা আর দুটি নেই।

তবু পটাচারা উপালীকেই ভালবাসে। এইটেই সহ্য করতে পারে না উপালী।

একদিন অসহ্য হয়ে ওঠাতে বলেছিল,—তুমি আমাকে ঘৃণা কর পটাচারা। আমি হতভাগ্য, ঘৃণার পাত্র। ঘৃণা করে আমাকে বাঁচাও। আমাকে ভালবেসো না। দোহাই তোমার, আমাকে ভালবেসো না।

কেঁদে ফেলেছিল উপালী। পটাচারাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল।

মিষ্টি স্বরে আস্তে আস্তে বলেছিল পটাচারা,—তুমি একটুতেই বড় অধৈর্য হও, উপালী!

ঠিক এই কথাই বলত উপালী পটাচারাকে যখন তারা শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে ছিল। তখন উপালী ছিল শান্ত সংযত, পটাচারা ছিল চঞ্চল ধৈর্যহীন।

কালের কি প্রভাব। তাদের স্বভাবের পরিবর্তন করে দিয়েছে কালের ঘটনাস্রোত।

উপালী তবু শান্ত হতে পেরেছিল কই? বলেছিল,—তুমি কেন আমাকে ভালবেসেছিলে? জান না, আমি কত হতভাগা!

পটাচারা সস্নেহে ওর মুখখানা তুলে ধরে বলেছিল তেমনি শান্তস্বরে,—সেইজন্যেই তো ভালবেসেছিলাম। ঠিকই করেছিলাম। আমি খুব সুখে আছি, উপালী।

উপালী আর কি-ই বা করতে পারে।

অলঙ্কার বিক্রয়ের সব অর্থ দিয়ে চেষ্টা করেছিল ব্যবসা করতে। প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। অমানুষিক পরিশ্রম করেছিল।

বাধা হয়ে দাঁড়াল এক ধনী শ্রেষ্ঠী। আবার সেই শ্রেষ্ঠী!

ও ব্যবসা আরম্ভ করেছিল তুলোর। বিশেষ করে সুতো তৈরী করবার তুলোর। এ ব্যবসা তখন শ্রাবস্তীতে যে শ্রেষ্ঠীর একচেটিয়া ছিল, সে উপালীর ওপর চটলো।

কে এই বিদেশী ? তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে নেমেছে তুলোর ব্যবসায়ে ?

যে দরে তুলো কিনল উপালী, শ্রেষ্ঠী লোকসান দিয়ে তার চেয়ে কম দরে তুলো বেচতে শুরু করল।

উপালী চোখে অন্ধকার দেখল।

গেল সেই শ্রেষ্ঠীর কাছে। তাকে অনুনয় করল ন্যায্য দরে তুলো বিক্রি করতে। শ্রেষ্ঠী তাকে তাড়িয়ে দিল।

ক্ষমতা থাকে সে তার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে বিক্রি করুক।

অনেক লোকসান হলো উপালীর। আরও একবার মনে হলো তার, এই শ্রেষ্ঠীরা কি নির্মম ! এরা কি মানুষকে বাঁচতে দিতে চায় না ?

ক্রমে ক্রমে অলঙ্কারের সব খোয়া গেল এ ব্যবসায়ে। উপালী রিক্ত হস্তে ব্যবসা ছেড়ে আবার ভাবতে বসল কি করা যায়।

ইদানীং পটাচারার শরীর ভাল যাচ্ছে না। একটি দাসী রেখেছে উপালী। কাজ করতে গেলে মাথা ঘোরে পটাচারার। তবু মুখে কিছু বলতে চায় না।

উপালী বোঝে, পটাচারার মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে উপালী সবই বোঝে। কিন্তু কি-ই বা করতে পারে ও !

একবার বলে,—এমন করে শরীর খারাপ হতে থাকলে আর কদিন বাঁচবে বল তো ?

পটাচারা হাসে তবু।—বাঁচব ঠিকই। শরীর কি শুধু আমারই খারাপ হয়েছে ? তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ ?

—রাঁধবার একটা লোক রাখলে ভাল হতো।

—কোন দরকার নেই। ভাবছি দাসীটাকেও বিদায় করে দেব।

—কেন ?

—এমনি।—পটাচারা উপালীর কাছে আসে। ওর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে,—শরীর এখন একটু খারাপ হবে।

উপালী তাকায় ওর মুখের দিকে।—কেন ?

—জানি না। তুমি কি বোঝ না ?

—কি করে বুঝব ?

—বাঃ! তুমি যে কি মানুষ! দিনরাত্রি রোজগারের ভাবনাই ভাবছ। আমার দিকেও তাকাবার অবসর পাও না।

—তা নয়। ইচ্ছে করেই তাকাই না পটাচারা। তাকালে তোমার চেহারা দেখলে মন আরও খারাপ হয়। মনে হয়, নিজে হাতে তোমায় মেরে ফেললাম।

—কি যে বলো! আচ্ছা ছেলে হবে, না মেয়ে হবে বলো তো ?

উপালীর মুখ দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—তাই নাকি ?

পটাচারার মুখটা একটু রাঙা হয়ে ওঠে।

উপালী বলে,—তবে তো রাঁধবার লোক একটি রাখতেই হবে।

—না। বরং কিছু জমাবার চেষ্টা করতে হবে। খরচ আছে তো।

—তা আছে। বৈদ্যশালায় গিয়ে খবর নিতে হবে, এ অবস্থায় কি খেলে শরীর ভাল থাকে। তাছাড়া ধাত্রীর খোঁজ নিয়ে রাখতে হবে।

—তোমায় ছুটোছুটি করতে হবে না। আমাদের যে দাসীটি আছে, ও সব জানে। ওই সব করবে, ওকে কিছু দিতে হবে।

—ওকে তো ছাড়িয়ে দেবে বলেছিলে ?

—তাই তো ভাবছি। কি যে করা যায়!

উপালীর মুখও খুব চিন্তিত দেখায়। ও বোঝে আর দাসী রাখবার মত অর্থ নেই। ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে

কয়েকটি স্বর্ণ ছিল, তা বোধহয় নিঃশেষ হয়ে আসছে। ভয়ে উপালী পটাচারাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। যদি বলে, নেই, তখন কি করবে উপালী ?

প্রতিদিনই ও এখানে সেখানে গিয়ে কর্মের চেষ্টা করছে। যে কোন কর্মের বিনিময়ে যদি কিছু অর্থ পায়। কোথাও মিলছে না।

যে শ্রেষ্ঠী ওকে ব্যবসায়ের প্রতিযোগীতায় সর্বস্বান্ত করেছে, গতকাল তার কাছে গিয়েছিল উপালী।

বলেছিল, তুলোর ব্যবসায়ে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাই যদি সে কোন কাজকর্ম দিতে পারে। শ্রেষ্ঠী হেসেছিল ; বলেছিল, এক পক্ষকাল পরে আবার দেখা করতে।

ওই একটি মাত্র ভরসা। মান অপমানকে তুচ্ছ করে তার কাছেই কাজ করতে রাজী হয়েছে উপালী। দরিদ্রের আবার মান কিসের ?

পটাচারার কাছে এ খবরটি পেয়ে আবও চিন্তায় পড়ল উপালী। একটা কিছু তো করতেই হবে। পটাচারা সন্তান-সম্ভবা। এ সময়ে হাতে কিছু অর্থ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। দাসীটিকেও যেমন করে পারা যায় রাখতেই হবে। আরও বেশী দায়িত্ব পড়ল উপালীর ওপর। সে এখন সন্তানের পিতা হতে চলেছে।

কিন্তু তার সন্তানের পরিচয় কি হবে ?

উপালী মনে কোন উত্তর পায় না। এ কথা সে কি করে অস্বীকার করবে যে তার সন্তান হবে জারজ। সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না। কোনমতেই নয়।

কন্যা যদি হয়, তার বিবাহের জন্য ভীষণ অবস্থায় পড়তে হবে। হয়তো বিবাহ হবেই না। হয়তো বা নর্তকী বা বিলাসিনী হয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

উপালীর কপালে ঘাম দেখা দেয়। পিতা হয়ে তাকে কি চোখের সামনে দেখতে হবে কন্যার সম্ভাব্য পরিণতি!

আর যদি পুত্র হয়? তবে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। পুত্রই হোক। পুত্র হলে সে স্বস্তি পাবে।

পটাচারার দিকে তাকায় উপালী।

পটাচারা কি এসব কথা ভেবেছে? ও ছেলেমানুষ, হয়তো এত তলিয়ে ভাবেনি। থাক, না ভাবাই ভাল।

উপালী বলে,—দাসীটিকে বিদায় দিও না। ওকে রাখতেই হবে।

পটাচারা কথা বলে না। ভাবনায় ওর চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে। যেন ঝিমোয় ও।

উপালী কথা পালটায়।—ছেলে হলে কি নাম রাখবে?

—ছেলে হবে বলছ? ছেলে হলেই ভাল।

—কেন?

পটাচারা ভয়ে ভয়ে বলে,—মেয়ে হলে একটু অসুবিধে হবে।

উপালী যেন কিছু জানে না।—কিসের অসুবিধে?

—জানি না।

পটাচারা উপালীর কাছে কথাটা ভাঙতে চায় না।

উপালী বলে—আমি একটু আগে এই কথাই ভাবছিলাম। ছেলে হলেই মঙ্গল।

—ছেলে হলে নাম রাখব সুদত্ত।

—তা মন্দ নয়। আচ্ছা, ছেলে হলে তোমার পিতাকে খবর পাঠালে মন্দ হয় না।

—কেন?

—তিনি খুশি হতে পারেন।

পটাচারার মুখটা বিষণ্ণ দেখায়।—তা হয়তো হতে পারেন। তাতে লাভ কি?

—লাভ কিছু নয়। তবু জানবেন, তুমি বেঁচে আছ, তোমার সন্তান হয়েছে। তোমার মা-ও হয়তো খুব খুশি হবেন।

পটাচারা এ কথার আর উত্তর দেয় না।

আস্তে আস্তে বলে,—কাজের কোন সন্ধান পেলে?

উপালী বোঝে ওর পিতার সম্বন্ধে আলাপ করতে ও চায় না। চুপ করে থাকে।

পটাচারা বলে আবার,—যা আছে, তাতে আর বেশীদিন চলবে না।

—কি করি বলো। চেষ্টা তো করছি।

—চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হবে।

—কিছুই বলা যায় না।

—কোন সন্ধানও পাওনি।

—পেয়েছি।

—কোথায়?

—তুলোর ব্যবসায়ে যার কাছে হেরে গেলাম, তার ওখানেই একটা কাজের কথা বলেছিলাম। সে আশা দিয়েছে।

পটাচারার মুখখানা আরও ম্লান হয়ে ওঠে।—ওখানে কাজ না করাই ভাল।

—কেন?

—ওরা হাসবে। তোমাকে দিয়ে যা খুশি তাই করাবে।

—লোকটি কিন্তু মন্দ নয়।

—শ্রেষ্ঠীদের তুমি চেনো না। আমি চিনি।

উপালী হাসল।—আমিও চিনি। কিন্তু উপায় কি বলো?

—অন্য কোথাও চেষ্টা করো না-হয়।

একটা পরিচয়ের সূত্র নিয়ে যেতে হবে তো। আর কারো সঙ্গে তো তেমন পরিচয় নেই। তাছাড়া অজ্ঞাতকুলশীল কোন

লোককে কেউ কাজ দিতে চায় না। আমি তো সত্যি পরিচয় দিতে পারি নে।

—কেন ?

—কি আর পরিচয় আছে যে দেব ? নামটাও মিথ্যে বলতে হয়।

—মিথ্যে না বলাই ভাল।

—মিথ্যে না বললে, যদি জানতে পারে আমি ক্রীতদাস ছিলাম ?

পটাচারা চুপ করে থাকে।

উপালী বলে,—আচ্ছা দেখি অন্য কোথাও চেষ্টা করে।

বিকেল হয়ে এসেছে। অদূরে আম্রকাননের ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগে। গবাক্ষের আবরণ উন্মুক্ত করে দেয় উপালী। একটু নিঃশ্বাস নিতে চায় ভাল করে। ভাবতে ভাবতে ওর হাঁপ ধরে যায়।

পটাচারা গবাক্ষের ফাঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে,—বাবাকে কি খবর দেবে ?

উপালীর মনটা তখন আকাশের মত ফাঁকা। ভাবনার শেষ করে দিতে চায় ও। নির্লিপ্ত স্বরে বলে—যা ভাল বোঝ,তাই করো।

—আমি আর কি বুঝব ?

উপালী কথা বলে না।

গবাক্ষের কাছ থেকে পটাচারার কাছে এগিয়ে আসে। ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

পটাচারা বলে,—কি দেখছ ?

—এইটুকুই শান্তি।

—কি ?

—তোমার মুখটি যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণই একটু শান্তি পাই।

পটাচারা মুখে হাসি আনে।—আমারও তাই।

—তবুও যে কেন ভয় করে বুঝি না।

—ভয়?—পটাচারা ওর বড় বড় চোখ দুটি তুলে তাকায়।—ভয়ই পাপ। ভয় করতে নেই।

—ঠিক বলেছ,—উপালী ওর কাছে আসে,—ঠিক বলেছ। তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ। তুমি না থাকলে যে আমার জীবনে কি হতো!

পটাচারা শান্ত চোখে তাকায়। কত শান্ত! কত শীতল প্রশান্তি ও চোখে!

তবুও কি বাঁচতে পারল উপালী? সে প্রেম পেল, কিন্তু প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার মত দুটো দানা পেল না কেন? দিনের পর দিন দুঃসহ হয়ে উঠছে ক্রমে।

কেটে গেছে কিছুকাল। পটাচারার সন্তান হয়েছে।

খুশি হয়েছে ওরা দুজনেই। পুত্রসন্তান হয়েছে। টুকটুকে মোটা-সোটা ছেলে। চোখ দুটি ভারী শান্ত। ভ্রমরের মত কালো। সুন্দর। উপালী ভাবে, কি সুন্দর! এমন সুন্দর সৃষ্টি পটাচারার মত মায়ের পক্ষেই সম্ভব।

—ঠিক তোমার মত।

পটাচারা ঘাড় নাড়ে। ঠোঁট দুটি সাদা ফ্যাকাশে। তবু হাসবার চেষ্টা করে বলে,—উঁহু। তোমার মত।

উপালী বড় বড় অবিন্যস্ত চুল কপাল থেকে সরিয়ে বলে,—ওটা তোমার মনের ভুল। চোখ দুটো দেখ। কি ঠাণ্ডা! আচ্ছা, ও কি কাঁদতে জানে না?

বাচ্চাটা কাঁদে না বড় একটা। হাত-পা নাড়ে। ঠোঁট নাড়ে। খেলে। খুব খিদে পেলে মুখে একটু একটু শব্দ করে। ভারী মিষ্টি শব্দ। ওটা কান্না নয় কিছুতেই।

পটাচারাও বলে,—সত্যি, কাঁদে না কেন বল তো?

—তোমার ছেলে কিনা, তাই।

—না ঠাট্টা নয়। না কাঁদলে ছেলে বলিষ্ঠ হয় না।

—কে বললে?

—ওই দাসী বললে। বললে, মুখে মধু দিও বেশী করে। গা গরম হবে। কাঁদবে।

—মধু খেলে বুঝি গা গরম হয়?

—হ্যাঁ, হয়। খুব শীতে বাবা মধু খেতেন।

—কেন? গরম হবার জন্যে?

—হ্যাঁ গো, সত্যি। মা-ও বলতো।

—তবে না হয় মধু খাওয়াও।

—আনতে হবে তো?

উপালী একটা ধাক্কা খায় যেন। মধু আনতে হবে। কি দিয়ে আনবে? যা সামান্য কটি রুপোর কাহন আছে, তাতে ভাত চলাই কঠিন।

তবু মধু আনতেই হবে। ভাত না হয় সে খাবে না। শুধু পটাচারাকে রেঁধে দেবে। তবু মধু আনতেই হবে।

বলে,—আনব। আজ বিকেলে বেরোব।

ভয়ে ভয়ে বলে পটাচারা,—কি দিয়ে আনবে?

—যা আছে, তাইতেই হবে।—একটু থেমে উপালী বলে,—কি করি বলো তো, এত চেষ্টা করেও তো কোথাও কোন কাজ পাচ্ছিনে।

পটাচারা ভাবতে ভাবতে বলে,—আচ্ছা, আমি বলি কি, রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে একবার দেখা করো না-হয়?

—ভয় করে।

—কেন, ভয় কিসের ?

—রাজাকে ভয় নয়। ভয় করে, উনি যদি জানতে পারেন, আমি ক্রীতদাস, এক শ্রেষ্ঠীকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে এসে এখানে রয়েছি। উনি হয়তো লিচ্ছবিরাজ্যে খবর দেবেন না। কিন্তু নিজেই শাস্তি দেবেন।

—কেন শাস্তি দেবেন ?

—আমাদের বিয়ে হয়নি বলে।

পটাচারা যেন অবাক হয়।—আমাদের বিয়ে হয়নি কে বললে ? বিয়ে আবার কাকে বলে ?

—এ বিয়ে তো সমাজ মানে না। রাজাও মানবে না। শাস্তি দেবে। কি শাস্তি দেবে জানো ?

—কি ?

—প্রাণদণ্ড নয়, তবে বেত্রদণ্ড, কারাগার-বাস নিশ্চয়।

পটাচারা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। উপালীর দিকে আর তাকায় না। না তাকিয়েই কথাটাকে হালকা করে দেবার জন্যে বলে,—আর আমাকে শাস্তি দেবে না ?

—না। তোমাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দেবে।

—বাঃ! দোষ বুঝি তোমার ? দোষ তো সবই আমার। আমি যদি গিয়ে বলি, সব দোষ আমার ?

—তবে কি হবে জানিনে। এ রকম কখনও এর আগে শুনিনি তো।

পটাচারা বলে,—থাক তবে, রাজার কাছে গিয়ে কাজ নেই।

উপালী বলে,—এক কাজ করতে পারি। তীর্থক অজিত কেশকম্বলের কাছে যেতে পারি।

—সে তোমার কি উপকার করবে ? সে তো তীর্থক ?

—তা বটে।

নিরুপায় হয়ে তুজনের মুখেই আর কথা জোগায় না। পটাচারা ছেলেকে আদর করতে থাকে। উপালী বসে বসে দেখে। বসে আর কতদিন চলবে? উপালীর সামর্থ্য আছে, শক্তি আছে, তবু কাজ পাচ্ছে না। এ এক আশ্চর্য প্রহসন।

হয়তো পটাচারার কথামত প্রসেনজিতের কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করতেন তিনি। রাজভাণ্ডার থেকে অনেকে এমন সাহায্য পায়। পরিমাণ যাই হোক না কেন, কোন অভাবগ্রস্ত প্রার্থী প্রসেনজিতের কাছ থেকে ফেরে না। কিছু না কিছু নিয়ে ফেরে। ভগবান তথাগতর ভক্ত কোশলরাজ প্রসেনজিৎ। দয়া তাঁর অনেক।

তবু উপালী তাঁর কাছে যেতে সাহস পায় না। ভয় হয়। হতে পারে ভয়টা হয়তো অহেতুক। তবু ভয় হয়। এ কথা ও কি করে ভোলে যে তার পূর্বমনিব শ্রেষ্ঠীকন্যাকে নিয়ে সে পালিয়ে এসেছে। এখনও তাকে বিয়ে করেনি।

পটাচারা কিন্তু ভয় পায় না। আশ্চর্য! ও জানে সত্যিকারের বিয়ে ওদের হয়ে গেছে। উপালীর সঙ্গে চলে এসে কিছুমাত্র অন্যায় করেনি। বরং জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ করেছে। ক্ষোভ তো নেই-ই। আনন্দ আছে পটাচারার। উপালী বোঝে না যে এ আনন্দ পটাচারা কোত্থেকে পায়।

অভাব যতই হোক না কেন, পটাচারার মুখের হাসি মেলায় না।

সে হাসিও বোধহয় এবার মিলিয়ে গেল। পটাচারাও আর হাসতে পারে না। নিদারুণ অভাবে ক্ষীণ হয়েছে নিজে, তবু হেসেছে। নানা রোগ দেখা দিয়েছে দেহে, তবু হেসেছে। এবারে আর হাসতে পারছে না।

তুর্দশা কত তুর্বিসহ হতে পারে তা আন্দাজ করতে পারা

যায় পটাচারার মুখ দেখে। চেষ্টা করেও আর হাসতে পারে না যখন দেখে তার সন্তানের জন্যে দিনান্তে একটু যবচূর্ণ জোগাড় করতে উপালী গলদঘর্ম হয়ে উঠছে। দুধের কথা তো অনেক দূর। একটু যবচূর্ণও যদি জ্বাল দিয়ে না খাওয়াতে পারে, তবে ছেলেটা বাঁচবে কি করে? ছেলের চিন্তায় পটাচারার মুখের হাসি মিলিয়েছে।

নিজের শরীরের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বছর আড়াই আগে বৈশালীর প্রাসাদে অলিন্দে স্তম্ভে হেলে দাঁড়িয়ে যে পটাচারা যে কোন পথিকের আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠত, যার নিটোল যৌবন, ভ্রমরচঞ্চল চোখ যে কোন রূপসীর ঈর্ষা জাগাতে পারত, সে আজ মলিনবসনা হতশ্রী একটি দরিদ্র বধূমাত্র। সেদিনের রক্তাধরা পটাচারা আজ রক্তহীন। মাথা তুলতেও তার কষ্ট হয়। এক অদ্ভুত শিরঃপীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় সে মাঝে মাঝে রাত্রে কাতরায়। উপালী পাশে শুয়ে থাকে। শুনেও শোনে না।

বৈদ্যশালায় গিয়েছিল। বৈদ্যের পরামর্শমত খাদ্য খাওয়াতে না পারলে সেখানে গিয়ে লাভ নেই। তাই আর যায়নি। চোখের সামনে পটাচারাকে যন্ত্রণায় কাতরাতে শুনেও চুপ করে শুয়ে থাকে উপালী। একটু নড়ে না। নড়তেও ভয় হয়। নড়লে যদি পটাচারা টের পায় সে জেগে আছে, তবে হয়তো ওই কাতরানি-টুকুও সে চাপবার চেষ্টা করবে। ওটুকু আরামও পাবে না।

পটাচারা ভাবুক সে ঘুমোচ্ছে। সে নিষ্ঠুর। সে নির্মম। ভাবুক পটাচারা। তবু যদি তাকে একটু ঘৃণা করতে পারে।

উপালী পাষাণ হয়ে গেছে। বেদনায় বেদনায় মন তার জমাট বেঁধে গেছে। এক আশ্চর্য কঠিন মন নিয়ে সে ঘরে থাকে আজকাল। ঘর থেকে সে চলে যেতেও পারে। হয়তো চলেও যেতো, শুধু পটাচারার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। সে চলে

থেকে পটাচারা শান্তিতে মরতে পারবে না। শুধু এইজন্যেই আজ পর্যন্ত সে গৃহে রয়েছে।

আর চলে না। ইদানীং ছেলেটার খিদের চিৎকার বড় বেশী অসহ্য লাগে। পটাচারার মুখও ক্রমে কঠিন হয়ে আসে। তবু মুখে কিছু বলে না। এক এক সময় ভাবে, তাকে ভিক্ষেয় বেরোতে হবে।

ভিক্ষে ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে পটাচারা। শ্রেষ্ঠী-কন্যার এই হয়তো শেষ পরিণতি। উপায় নেই। ছেলেকে তার বাঁচাতেই হবে। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য সে সব করতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় পটাচারা সত্যিই বেরোল পথে। পথে পথে ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে পথের পাশে বৃক্ষের নীচে বসল অনেকবার। তবু ভিক্ষে চাইতে পারল না কিছুতেই। কোন পথিকের কাছেই ভিক্ষে চাইতে পারল না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গৃহে ফিরে এলো।

ফিরে এসে দোরের সামনেই উপালীর সঙ্গে দেখা।

উপালী ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।—কোথায় গিয়েছিলে?

উপালীর স্বরটা কি কঠোর? উপালী কি তাকে সন্দেহ করছে?

কেঁদে ফেলল পটাচারা। কাঁদতে কাঁদতে টলে পড়ে যাচ্ছিল। উপালী ওকে জড়িয়ে ধরল। আর একটা কথাও বলল না।

অনেক কেঁদে বুকটা একটু হালকা হলো ওর।

এতক্ষণে ও কথা বলতে পারল,—বেরিয়েছিলাম ভিক্ষে করতে। পারলাম না। কিছুতেই চাইতে পারলাম না। মুখে বাধল।

আবার কেঁদে ফেলে পটাচারা।

উপালীর চোখেও জল।

ধরে নিয়ে এলো ঘরে। পটাচারাকে জল খাইয়ে সুস্থ করে ধীরে ধীরে বলল উপালী,—শোন পটাচারা, একটি শেষ উপায়ের কথা তোমাকে বলি।

—বলো।

—তোমাকে বাঁচতে হবে, খোকাকেও বাঁচাতে হবে। চল তোমাদের তোমার পিতার কাছে নিয়ে যাই। তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন না জানি, তাই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব।

—তোমাকে ছেড়ে—

—না, না, পটাচারা। আমার জন্যে ভেবো না। আমি একা ভালই থাকব। মাঝে মাঝে তোমাদের দেখে আসব বাইরে থেকে। তুমি খোকাকে নিয়ে অলিন্দে দাঁড়াবে। আমি একটু দেখব, আবার চলে যাব। তোমাকে যেমন করে হোক ঠিকানাও আমি জানাব।

—তুমি কি করবে?

—কিছু ঠিক করিনি। একটা কাজ জুটিয়ে নেবো। আমার জন্যে ভেবো না। খোকা বাঁচুক, তুমি বাঁচ। খোকা বড় হলে, ওকে আমার কথা কিছু বোলো না। শুনলে ও ওর বাবাকে ঘৃণা করবে। সেটা আমি সইতে পারব না। বোলো ওর বাবা মরে গেছে।

উপালীর কর্কশ গাল বেয়ে জল পড়ে। উপালী কাঁদে।

পটাচারাও কাঁদে।

—আমার সবচেয়ে কষ্ট কি জান, আমরা হেরে গেলাম।

—না, আমরা জিতলাম। আমাদের ওই সন্তান আমাদের জিতিয়ে দিল। তোমার বাবা আর তোমাকে বিয়ে দিতে পারবেন না।

ছেলেটার ঠোঁটের কাছে একটা আঙুল রাখে উপালী। খিদের জ্বালায় ছেলেটা আঙুলটা মাড়ি দিয়ে কামড়ায়।

উপালী হাসে। ভারী বিষণ্ণ হাসি।

বলে,—যবচূর্ণ এনেছি। ওকে জ্বাল দিয়ে দাও।

পটাচারা আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করে।

—থাক। আমিই জ্বাল দিয়ে দিচ্ছি।

পটাচারা ওকে ধরে ওঠে। ওকে বসায়। বলে,—তবে কবে যাবে ?

—কালই চলো।

পটাচারা এতকাল পরে রাজী হয়।—তাই চলো।

পরদিন ভোরে উঠে ওরা বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। পটাচারা সঙ্গে কিছু নিল না। একটা ছেঁড়া ঘাঘরায় জড়িয়ে নিল ছেলেটাকে। উপালীও সঙ্গে কিছু নেয়নি। সঙ্গে কিছু নেবার উপায় নেই। গরুর গাড়িতে যাওয়া যাবে না। অর্থ নেই। হেঁটে যেতে হবে।

যাবার আগে নিজের গোছান সংসারের দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে পটাচারা বললে,—তুমি ফিরে এসে এসব বিক্রি করে দিও।

উপালী বলে,—বাড়িটাও বিক্রি করে দেব ?

—তাতে তোমার কিছুদিন চলবে।

উপালী কথা বলে না। এ ব্যর্থতার সবটুকুই উপালীর। ও জানে ও নিজে ওর স্ত্রী-পুত্রকে যেখানে রেখে আসবে, সেখানে যাবার মুখ ওর কোনদিনই থাকবে না। তবু যেতে হবে, তবু ওদের দিয়ে আসতে হবে সেখানে। নিয়তি কি নির্মম !

চলতে চলতে পটাচারাকে বিশ্রাম করতে হলো দু'চারবার। শরীর ওর অত্যন্ত দুর্বল। যেমন রুগ্ন, তেমনি রক্তহীন।

প্রয়োজন হলে উপালী ওকে কোলে করে নিয়ে যাবে। উপালীর গায়ে এখনও শক্তি আছে। সব সামর্থ্য ওর শেষ হয়ে যায়নি।

দুপুরের কিছু আগেই ওরা এসে পড়ল অচিরবতী নদীর অপর পারে। পটাচারা স্নান করল। একটু ঠাণ্ডা হলো।

বলল,—দুপুরে একটু বিশ্রাম করলে হতো না?

—না। দু'তিনদণ্ড বিশ্রাম করতে পার, কিন্তু সন্ধ্যার আগেই আমাদের পৌঁছোতে হবে। তা পঞ্চাশ যোজন পথ তো হবেই।

পটাচারা ভয় পায়।—একদিনে আমি যেতে পারব তো?

—তা পারবে। না হয় মাঝে পথে কোন গরুর গাড়ি দেখলে তোমাকে তুলে নিতে অনুরোধ করব। তোমাকে দেখলে হয়তো তাদের দয়া হবে।

—চলো। শোনো, ওই জলসত্রে একবার যাবে, সেই বুড়ী যদি থাকে?

—তা মন্দ নয়, চলো।

ওরা আসবার সময় যে বৃদ্ধার কাছে রাত্রে আশ্রয় পেয়েছিল, সেই প্রপার দিকে এগোয় নদীর পাড় দিয়ে। ছেলেটাকে কোলে নিয়েছে উপালী।

প্রপার কাছে পৌঁছে দেখে সেখানে একটি যুবক বসে রয়েছে।

উপালী কাছে এগোয়।

যুবক প্রশ্ন করে,—আপনি জল খাবেন?

উপালী চারিদিকে তাকিয়ে বলে,—এখানে যে একটি বৃদ্ধা থাকত, সে কোথায়?

যুবক হাসে।—অ! সে মারা গেছে। এখন আমিই এখানকার প্রপাপালক।

উপালী স্তব্ধ হয়ে থাকে। পটাচারাও একটা কথা বলে না। বলতে পারে না।

ওরা ফেরে ওখান থেকে।

শীতের দুপুরে নিস্তব্ধ নদীতীরের বিস্তীর্ণ বালুকাময় মাঠে বাতাস বইছে জোরে। বাতাসের শব্দে সেই বৃদ্ধার আক্ষেপ কানে আসে যেন। গভীর নিস্তব্ধ দুপুর।

পটাচারা উপালীর একটা হাত ধরে। ওর হাত ঠাণ্ডা।

—কি হলো ?

—আমার ভয় ভয় করছে।

—কেন ?

—মনে হচ্ছে যেন সেই বুড়ী আমার পেছনে পেছনে আসছে। পিঠে নিঃশ্বাস লাগছে।

উপালী পিছন ফিরে তাকায়। হাসে।—ও কিছু নয়। শীতের বাতাস। তোমার মনের ভুল।

দুর্বল শরীর নিয়ে পটাচারা পথ চলে উপালীর পাশে পাশে।

অচিরবতী নদী অনেক পেছনে ফেলে ওরা দ্রুতপায়ে চলতে থাকে। পটাচারা মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার জন্যে বসে পড়ে।

সাদা চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে ওর অপরিসীম দুর্বলতায়। এতটা পথ কি ও যেতে পারবে ? পা যে আর চলে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। রুগ্ন বুকখানা হাপরের মত ওঠে নামে। আবার বসে পড়ে ও।

উপালী কাছে এসে ওর পাশে বসে। ওর কপালে চুল বেয়ে ঘাম ঝরছিল, মুছে দেয় উপালী।

অতি মৃদু স্বরে বলে,—কষ্ট হচ্ছে খুব ?

পটাচারা হাঁপাতে হাঁপাতে তাকায় শুধু। কথা বলে না।

—তবে না হয় এখানে বোস। দেখি কোন গাড়ি যদি এ

পথে বৈশালীর দিকে যায়, তবে তার ওপর তোমায় তুলে দেব।

ছেলেটিকে পটাচারার কোলে দেয়।

সময় কাটে। গাড়ি আসবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কোথায় গাড়ি? তবে কি এখানেই দিনটা কাটাতে হবে? তারপর রাত্রি এলে কোথায় আশ্রয় নেবে ওরা? কে আশ্রয় দেবে?

পটাচারা নিজেই ওঠে।

—উঠলে যে?

—চলো। যেতে পারব।

উপালী ওঠে। ওর হাত ধরে সস্নেহে বলে,—একটু কষ্ট করো। তারপর রাত্রে গিয়ে প্রাসাদে তোমার সেই পুরোনো ঘরে শোবে, প্রাণভরে খাবে, ঘুমোবে।

পটাচারার চোখ দুটোও যেন আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গায়ে একটু শক্তি পায়। আবার পথ চলতে থাকে। পথের কি শেষ নেই? আসবার সময় তো এত সময় লাগেনি। আজ এত সময় লাগছে কেন? সময়টা কি বেড়ে গেছে? কখন ওরা পৌঁছোবে বৈশালীতে?

বিকেলের দিকে এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের কাছে এসে আবার বিশ্রাম করতে বসে ওরা। উপালী কাছাকাছি একটি ছোট জনপদে গিয়ে একটু দুধ নিয়ে আসে একটা মাটির ভাণ্ডে। ছেলেটা ধুঁকছে। ওকে কিছু খাওয়াতে হবে।

অনেকটা দুধ দিয়েছে। বাচ্চা ছেলের নাম করে চেয়ে নিয়ে এসেছে উপালী এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে।

পটাচারার চোখ দুটো খুশি-খুশি। উপালীরও।

ছেলেটাকে খাইয়ে দুধ বেশি থাকে। পটাচারা বলে,—তুমি খাও।

উপালী বলে,—তুমি খাও।

দুজনেই দুজনকে খাওয়াতে ব্যস্ত। শেষ পর্যন্ত উপালী জোর করে পটাচারাকে খাওয়ায়।

গায়ে একটু জোর পায় ও।

আর বেশি দূর নয়। এই প্রান্তরটা পেরোলেই বৈশালীর সীমানায় পৌঁছোব।

আশা। শুধু আশা!

বেশ দ্রুত পেরিয়ে আসে ওরা প্রান্তরটা। সন্ধ্যার কিছু আগেই বৈশালীর ভেতরে ঢুকে পড়ে। উপালী নিজের মুখের অর্ধেক ঢেকে দেয় কাপড় দিয়ে। যদি কেউ চিনতে পারে?

বৈশালীর ভেতর দিয়ে যতই ওরা প্রাকারের কাছে বিরূঢ়কের প্রাসাদের দিকে এগোতে থাকে, পটাচারার মুখখানি ততই শুকিয়ে যায়। উপালীর গা ঘেঁসে চলতে চলতে একবার বলে ওঠে,—চলো না-হয় ফিরে যাই। দরকার নেই ওখানে গিয়ে।

উপালী গভীরভাবে অন্যমনস্ক ছিল। চমকে উঠে বলে,—কেন?

পটাচারা চোখের জল মোছে। রুদ্ধকণ্ঠে বলবার চেষ্টা করে,—তোমাকে যে আর দেখতে পাব না!

উপালীর নিজের চোখও ভিজে উঠছে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,—আমি আসব। মাঝে মাঝেই আসব। ভাল না লাগে আবার না হয় বেরিয়ে এসো।

—আর কি বেরোতে পারব? তুমি কবে আসবে বলো?

—তা কি ঠিক করে বলা যায়। এক কাজ কোরো, রোজ দুপুরে তুমি যেমন অলিন্দে দাঁড়াতে তেমনি দাঁড়িও, আমি আসব।

প্রাসাদের কাছাকাছি এসে পূর্ব-প্রাকারের পাশে একটা বিরাট গাছের তলায় উপালী বসে পড়ে।

পটাচারা উপালীর দিকে বার বার তাকায়। ওখান থেকে বিরূঢ়কের প্রাসাদ দেখা যায়। যেতে যেতে পটাচারা বার বার পিছন ফিরে তাকায়।

পটাচারা প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল ভয়ে ভয়ে। সেই প্রাসাদ। এই প্রাসাদে শৈশব থেকে বহুকাল কেটে গেছে। এই প্রাসাদেরই কন্যা সে।

প্রাসাদের দ্বারের পাশে এসে দাঁড়ায়। বার বার ভাবছে ভেতরে ঢুকবে কিনা?

শীতের সন্ধ্যায় ওর হাতের তালু ঘামে। শরীর ঝিম ঝিম করে। আর যেন দাঁড়াতে পারছে না। ভেতরে গিয়ে যদি শোনে বাবা নেই। মরে গেছে। যদি শোনে মা-ও নেই।

কি করবে পটাচারা?

ও কে? কে দ্বারের দিকে আসছে?

অতি মন্থর গতিতে কে হেঁটে আসছে দ্বারের দিকে? ওই তো বিরূঢ়ক!

—বাবা!

পটাচারার মুখ থেকে বেরোয় শব্দটা।

—কে?

বিরূঢ়ক থমকে তাকায়। দ্বারের সামনে এসে পটাচারার দিকে নজর পড়ে। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বোধহয় বিহারে গিয়েছিলেন। মুখখানি প্রশান্ত।

পটাচারার দিকে লক্ষ্য করে বলে,—কে?

—বাবা!—পটাচারার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ।

পটাচারার চেহারা দেখে চেনা যায় না। বিরূঢ়ক আরও কাছে আসে। ভাল করে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে পেছন ফিরে বলে,—কে তুমি?

—আমি পটাচারা।

—মিথ্যে কথা। পটাচারা মরে গেছে।

—আমি ফিরে এসেছি বাবা।

বৃদ্ধের কণ্ঠে অপূর্ব দৃঢ়তা।—আমার কন্যা মরে গেছে। তার ফেরবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

—তোমার দৌহিত্রকে সঙ্গে এনেছি বাবা। ওকে যে খেতেও দিতে পারছিনে।

বৃদ্ধ নীরব।

—একটু আশ্রয় নিতে এসেছিলাম, বাবা।

বৃদ্ধের কণ্ঠ অন্ধকারে বর্শাফলকের মত পটাচারার বুকে বেঁধে। —আমার এ প্রাসাদে আমার কন্যার আশ্রয় নেই। দৌহিত্রকে রেখে যেতে পার।

পটাচারা বসে পড়ে। ওর পা দুটো থরথর করে কাঁপছে।

পটাচারার চোখে আর জল নেই। সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা বরফের মত জমে আসছে।

ক্ষীণ অথচ দৃঢ় ভাবেই ও বলে,—তবে তাই হোক। তোমার দৌহিত্রকে রেখে গেলাম। ওকে মানুষ করে তুলো। বড় হলে বোলো, ওর মা-বাবা মরে গেছে। আমি আর কোনদিন আসব না।

ছেলেটিকে মাটিতে নামিয়ে পটাচারা বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে উঠে পড়ে।

আস্তে আস্তে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে যায়।

বৃদ্ধ এবার ফেরে। উত্তরীয় দিয়ে চোখ মোছে। ধীর পায়ে এগিয়ে শিশুটিকে বুকে তুলে নেয়। তারপর প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

উপালী বৃক্ষের নীচে বসে অপেক্ষা করছে। ভাল করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছে প্রাসাদের দিকে। ওরা ভেতরে গেল কিনা

এটা সে জেনে যেতে চায়। কিছুই দেখা যায় না। আজ কি কৃষ্ণা চতুর্দশী?

উপালী উঠে মুখটা অনেকটা ঢেকে ধীরে ধীরে এগোয় খুব সন্তর্পণে।

ওই তো প্রাসাদ? দ্বারের সামনে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না? ওরা কি ভেতরে চলে গেছে?

উপালীর বুকের ভেতরটা শূন্য বোধ হয়।

অতি সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে এগোতে থাকে।

এ কে? পথের এক পাশে ঘোমটা মাথায় বসে পড়েছে। কে?

দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে দেখে—পটাচারা। থরথর করে কাঁপছে। বোধহয় ওঠবার শক্তি নেই আর।

উপালী ওর কাছে গিয়ে একটা কথা না বলে ওকে কোলে তুলে অতি দ্রুত সেই বৃক্ষের তলায় চলে আসে। কোলের ওপর ওকে শুইয়ে ওর মুখে হাত দেয়।

পটাচারা একটু শব্দ করে। যন্ত্রণার চাপা আর্ত শব্দ।

—খোকা কই?

অতি ক্ষীণ স্বরে বলে পটাচারা,—ওর দাদু নিয়ে গেছে।

—আর তুমি গেলে না কেন?

পটাচারা আবার শব্দ করে। কান্নার শব্দ নয়। এক ভয়াবহ যন্ত্রণার শব্দ।

উপালী একটু ভেবে বলে,—বুঝেছি, তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বুকে দুহাত চেপে—উঃ—শব্দ করে ওঠে পটাচারা।

—কি হলো?

—বুকে ভীষণ যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না।

উপালী ভয় পেয়ে যায়। সমস্ত দিন হেঁটে এই রুগ্ন শরীরে

পটাচারা বোধহয় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখানে আশ্রয় নিতে যাওয়া বিপজ্জনক। বৈশালীর সীমান্ত পেরিয়ে যেতে হবে।

রাত্রি হয়ে এসেছে। প্রাকারের বাইরে দিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

পটাচারাকে কাঁধে নিয়ে অতি দ্রুত পায়ে চলতে থাকে উপালী।

জনপদ ছাড়িয়ে সেই প্রান্তর। অন্ধকার বিশাল প্রান্তর। এ প্রান্তর না পেরোলে তো অন্য কোন জনপদের কোন গৃহে আশ্রয় মিলবে না।

কাঁধের ওপর পটাচারাকে নিয়ে উপালী খুব জোরে হাঁটতে থাকে।

সুতীব্র শীতের ঠাণ্ডা বাতাসে সর্বাঙ্গ জমে আসছে। খুব দ্রুত চলেছে উপালী। আশ্রয় চাই। একটু আশ্রয়। একটু খাদ্য। পটাচারাকে বাঁচাতে হবে।

প্রান্তর পার হয়ে এসেছে। ওই দেখা যাচ্ছে অনতিদূরে একটি ছোট জনপদের আলো। এসে গেছে উপালী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পটাচারাকে কাঁধ থেকে নামাতে যায়।

একি! বুকের সমস্ত রক্ত জমাট হয়ে আসছে উপালীর। একি দেখছে সে! পটাচারার সর্বাঙ্গ শক্ত কাঠের মত হয়ে গেছে।

—পটাচারা!

উপালীর গভীর আর্তনাদ প্রান্তরের শীতল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, মিলিয়ে যায়।

চিৎকার করে ওঠে উপালী,—পটাচারা!

পটাচারা আর কোনদিন কথা বলবে না। কোনদিন আর উপালীর মুখের দিকে তাকাবে না।

অন্ধকার প্রান্তরে উপালীর দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে যায় বার-বার।

পটাচারার মৃতদেহ কাঁধে রেখে অতি ধীর পদে চলতে থাকে উপালী। বিশাল শূন্য ভেদ করে চলেছে। শুধু চলেছে। কিছু ভাবছে না। কিছু দেখছে না। এক শূন্যতায় আবিষ্ট হয়ে চলেছে।

তখনও ভোর হয়নি। অচিরবতী নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ায়। সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পটাচারার মৃতদেহ দুহাতে ধরে নিজে হাতে অচিরবতী নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। মুহূর্তে দেহটা স্রোতের জলে মিশে যায়।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উপালী। সোজা হয়ে।

নদীর পূর্বপ্রান্ত রক্তিম হয়ে উঠছে। উপালীর আরক্তিম চোখের মত।

উপালী ধীরে ধীরে ফিরে দাঁড়ায়।

দূরে অচিরবতী নদীতীরে এক ঘন বন লক্ষ্য করে সেই দিকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

এরপর উপালী উদ্‌ভ্রান্ত মনে বনে আর নদীতীরে কয়েকদিন কাটাল। তার জীবনের ভয়াবহ দিনকটির কথা কাহিনীর শুরুতে আছে।

দিনকতক পরে সে তার জীবনের ভবিষ্যত দিনগুলোর জন্যে এক ভীষণ কর্মপন্থা আবিষ্কার করল। স্থির করলো সে এর পর কি করবে।

সে কথা পরে হবে।

সুদীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেছে তারপর। দীর্ঘ সময়ে বৈশালীর আরও উন্নতি হয়েছে। ভগবান বুদ্ধের অমোঘ মঙ্গল প্রভাবে বৈশালী ধীর প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। ভিক্ষু সম্প্রদায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, আর বৃদ্ধি পেয়েছে গৃহস্থ শীলসাধন।

বিরূঢ়কের প্রাসাদের অলিন্দের স্থানে স্থানে ফাটল ধরেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ বিশ বছরের এক যুবক। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকান্তি, শক্তিবান যুবক।

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি যুবক। রুগ্ন কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত তার মুখ।

—সত্যি ?

—সত্যি। হেসো না ভাই। তুমি পরীক্ষা করে দেখো।

—তুমি চিকিৎসা শাস্ত্রের কি জান ?

—আমি বাড়িতে পড়েছি। বাবাকে বলেছি, আমি তক্ষশীলায় চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে যাব। তুমি দেখো, তোমার কোষ্ঠকাঠিন্য একেবারে সেরে যাবে।

—ওষুধ কি ?

—ওষুধ ? তিনটি পদ্মের মধ্যে একটি মৃদুবীর্য ওষুধ দিতে হবে।

—বেশ দিও। দাদুকে বলব, অনিরুদ্ধ আমাদের গৃহবৈদ্য হবে।

বিরূঢ়ক ঠিক এই সময়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। অতি বৃদ্ধ হয়ে কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে বিরূঢ়ক। গৌরবর্ণ যুবকটির কাছে এসে দাঁড়ায়।

যুবকটি বলে,—দাদু, অনিরুদ্ধকে আমাদের গৃহবৈদ্য করে নাও।

বিরূঢ়ক হাসে।—কেন ?

—ও চিকিৎসাশাস্ত্র খুব ভাল জানে। আমাকে ওষুধ দেবে।

—বেশ তাই হবে। এখন চলো। আমাকে ত্রিপিটক পড়ে শোনাবে চলো।

অনিরুদ্ধ বলে,—আচ্ছা, আজ চলি ভাই। বিকেলে যাচ্ছ তো?

—যাব।

বলে যুবকটি বৃদ্ধ বিরূঢ়কের সঙ্গে ঘরের দিকে যায়।

এই পটাচারার সন্তান। মুখখানি পটাচারার মত মিষ্টি, বিশেষ করে ডাগর চোখ দুটি। দেহের গঠন শক্তিবান, উপালীর মত সুদীর্ঘ। বিরূঢ়ক অতি যত্নে এত বড় করে তুলেছে ওকে।

পথ থেকে ওকে তুলে নিয়ে এসেছে, তাই ওর নাম রেখেছে পন্থক।

পন্থক বড় হয়ে তক্ষশীলায় অধ্যয়নের জন্যে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বিরূঢ়ক পাঠায়নি। পন্থককে সে ছেড়ে থাকতে পারে না একমুহূর্ত। ও তার জীবনের একমাত্র আশা। তার অনেক আদরের পটাচারার সন্তান। পটাচারার শোক সে অনেক ভুলেছে পন্থককে পেয়ে। তবু বৃদ্ধের চোখ মাঝে মাঝে বিস্ফারিত হয়, মনে হয় পটাচারার কথা। এই আকাশের নীচে সে হয়তো আজও বেঁচে আছে। সেদিন যে সে চলে গেল, বিতাড়িত হয়ে চলে গেল, এলো না আর একদিনও। দীর্ঘ কুড়ি বছরের ভেতর আর একদিনও এলো না।

আকাশের দিকে বিস্ফারিত চোখ মেলে থাকত বৃদ্ধ বিরূঢ়ক।

—দাদু! ডাকত পন্থক।—অ দাদু।

বিরূঢ়ক তাকাত।

—কি ভাবছ?

—কিছু না ভাই।

পন্থক বৃদ্ধের কোলের ওপর শুয়ে পড়ে দুষ্টুমি শুরু করত।

আবার সব ভুলে যেত বিরূঢ়ক। পটাচারার শোক ভুলে যেত।

পন্থককে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। তাই তক্ষশীলায় যেতে দিল না তাকে।

—তবে কি অধ্যয়ন করতে পারব না ?

—হ্যাঁ। উচ্চবিদ্যার জন্যে আমি অধ্যাপক রেখে দেব তোমার জন্যে।

—তক্ষশীলায় গেলে দোষ কি ?

বিরূঢ়ক ওকে জড়িয়ে ধরে বলত,—না।

না পাঠাবার আর একটা কারণও ছিল। পন্থকের পিতৃ-পরিচয় শুনে হয়তো অনেকে তামাসা করবে, হয়তো অনেকে হেয় করবে। তাই ওখানে না যাওয়াই ভাল।

মধ্যে মধ্যে পন্থক তাকে প্রশ্ন করত,—আমার বাবা মা দুজনেই কি মরে গেছে দাদু ?

মিথ্যে কথা বিরূঢ়ক বলবে না। সে পঞ্চশীলের সাধক।

তাই বলত,—বোধহয়। তারা চলে গেছে। কোথায় আমি জানি না।

—কেন চলে গেল দাদু ?

—পালিয়ে গেল। কেন কি করে বলব ?

পন্থক আর কিছু বলত না, কিন্তু বিরূঢ়ক লক্ষ্য করত পন্থকের মুখখানি ম্লান হয়ে গেছে। এসব প্রশ্ন আর বড় একটা করত না পন্থক। মনে মনে কি ভেবে নিয়েছিল কে জানে। বিরূঢ়ক বেঁচে গেল। আরও বেশী কথা জিজ্ঞেস করলে হয়তো সে যা জানে, সব সত্যি কথাই তাকে বলতে হোত। তাই বেঁচে গেল বিরূঢ়ক।

মাঝে মাঝে বিরূঢ়কের মনে হয়, কেন আবার এ বন্ধন ! বন্ধন কেটে গিয়েছিল, ভালই হয়েছিল। সে বিহারে ভিক্ষুদের

সঙ্গেই বেশী সময় কাটিয়ে মনকে অনেক নির্লিপ্ত করে ফেলেছিল। ভগবান শাস্তার উপদেশ তার প্রাণে শান্তি দিয়েছিল। কিন্তু পটাচারা এই পন্থককে দিয়ে গিয়ে তাকে আবার বন্ধনে জড়াল। কি দুর্ভোগ!

পন্থককে নিয়েই সে অনেক সময় বিহারে যেত। ভিক্ষুদের উপদেশ শুনত। পন্থকও শৈশব থেকে শুনত। এটা বৃদ্ধের ভাল লাগত। ছোটবেলা থেকে ধর্মে অনুরাগ হওয়া ভাল।

হয়তো কখনো পন্থক জিজ্ঞেস করত,—ভিক্ষুরা কি প'রে আছে দাদু?

বিরূঢ়ক বলত,—ত্রিচীবর।

—ত্রিচীবর মানে?

—ত্রিচীবর মানে তিনটি কাপড়। সংঘাটি, উত্তরসঙ্গ আর অন্তর্বাসক।

—ভিক্ষুরা কি খায় দাদু?

—তারা বিহারে খাবার ঘরে ভক্তোদ্দেশকের ঘরে যায়। হাতে একটি শলাকা থাকে। শলাকাটি দেখালে ভক্তোদ্দেশক খাবার দেয়।

—খেয়ে কি করে?

—ধ্যান করে। মার্গসুখ লাভ করে।

—সব সময়েই ধ্যান করে?

—না। সব সময় কি আর ধ্যান করতে পারে? উপদেশ শোনে, আবৃত্তি করে, পাঠ করে।

পন্থক বলে,—ওরা বেশ আছে, না দাদু?

খুব খুশি বৃদ্ধ।—হ্যাঁ। খুব ভাল আছে।

—আমাকে ত্রিচীবর দেবে দাদু?

—বড় হয়ে যদি ইচ্ছে হয় বিহারে গিয়ে নিও।

—তাই নেব। দেখো, আমি বড় হয়ে ভিক্ষু হবো।

—ভাল তো। তাই হবি।

বৃদ্ধ খুব আনন্দ পায়। শৈশব থেকেই ওর ভিক্ষু হবার সাধ। বিহারে না গেলে রেগে যায়। ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে বসে। তাদের সঙ্গে কথা বলে। বিরূঢ়কের খুব ভাল লাগে।

তক্ষশীলায় যাওয়া বন্ধ করলেও পন্থকের পড়া বন্ধ করে না বিরূঢ়ক। এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের গৃহে নিয়ে গিয়ে তার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করে আসে। এই বৃদ্ধ তক্ষশীলার অধ্যাপক ছিলেন কিছুকাল।

এর গৃহ বিরূঢ়কের প্রাসাদ থেকে বেশ খানিকটা দূর। জনপদের পশ্চিম প্রান্তে।

পন্থকের ভাল লাগে অধ্যাপককে।

অধ্যাপকও তাকে পুত্রস্নেহে যত্ন করে পড়ায়। অধ্যাপকের কনিষ্ঠ পুত্র অনিরুদ্ধও একসঙ্গে পড়ে। ক্রমে সে পন্থকের বন্ধু হয়ে পড়ে।

অনিরুদ্ধ পন্থকের প্রাসাদে আসে। মাঝে মাঝে সমস্ত দিন থাকে। এখানে খায়ও মধ্যে মধ্যে। বিরূঢ়কও অনিরুদ্ধকে খুব ভালবাসে। ছেলেটি রুগ্ন। বড় বুদ্ধিমান ভাল ছেলে।

পন্থক রোজই যায় অনিরুদ্ধর গৃহে বৈকালে। সন্ধ্যায় অধ্যয়ন করে। রোজই যে অধ্যয়ন করে তা নয়, তবু রোজ যায়। রোজই যে অনিরুদ্ধর টানে যায়, তা নয়। আর একটি টান আছে পন্থকের—সে অধ্যাপকের কন্যা মধুশ্রী।

অনিরুদ্ধর চেয়ে ছোট বছর চারেকের। ষোল থেকে সতের বছর বয়েস। গায়ের রঙ মাজা।

পন্থক বলে,—চাঁদের গুঁড়ো দিয়ে মাজা।

মুখখানি মিষ্টি, নরম, শান্ত।

পন্থক বলে,—ও মুখে ভ্রমর বসা আশ্চর্য নয়। মধু ঝরছে।

মধুশ্রী রাগ করে না। বলে,—তবু তো দাদার মত খেতে পাই না তোমাদের বাড়ি। দাদা কত খায়।

পঙ্কক বলে,—আমাদের বাড়ির ভাত খেলে কিন্তু রোগা হয়ে যাবে অনিরুদ্ধর মত।

—আমি রোগা?—অনিরুদ্ধ প্রতিবাদ জানায়—এক রকম ঘি মাখছি গায়ে। দেখবে কি রকম মোটা হয়ে যাই।

—ঘি মেখে?—পঙ্কক হেসে ওঠে। মধুশ্রীও।

মধুশ্রী বলে,—দাদার ওষুধের বাতিক আছে।

—ও তো বলে, ও বৈদ্য হবে। চিকিৎসাশাস্ত্র শিখবে। শল্য চিকিৎসা শিখো না যেন?

—কেন?

—অস্ত্র ধরলে অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তখন তোমার জন্যেই বৈদ্য ডাকতে হবে।

আবার হেসে ওঠে মধুশ্রী।

অনিরুদ্ধ ম্লান মুখে বলে,—ঠাট্টা করছ, করো। যখন শিখব, তখন দেখো।

পঙ্কক ওর কাঁধে হাত রাখে।—ঠাট্টা নয় ভাই। তোমার যাতে ভাল হয়, সেটা আমরাও চাই।

অনিরুদ্ধ চলে যায়।

একা ঘরে মধুশ্রীও চলে যেতে চায়।

পঙ্কক ডাকে,—শোন।

মধুশ্রী তাকায়।

পঙ্কক আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলে,—একটু জল খাওয়াবে?

মধুশ্রী চলে যায়। একটি ভাণ্ডে জল এনে দেয়। পঙ্কক জল খেয়ে বলে,—আরও জল চাই।

মধুশ্রীর মিষ্টি মুখে কৌতূহল। বলে,—তোমার তৃষ্ণা বড় বেশী।

—খুব। তৃষ্ণা আমার বড় বেশী। তুমি মেটাও।

—জল দিয়ে?

—আমি জানি না কি দিয়ে।

মধুশ্রী একটু গম্ভীর হয়ে ভেবে বলে,—অত তৃষ্ণা ভাল নয়। শাস্তা তৃষ্ণা ত্যাগ করতে বলেন।

—তৃষ্ণা যেদিন ত্যাগ করব, সেদিন বিহারে চলে যাব।

—ভিক্ষু হবে?

—হ্যাঁ।

মধুশ্রী মুখ টিপে হাসে।—তুমি হবে ভিক্ষু?

—কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

—ভাব-সাব দেখলে মনে হয় না। সে সব মানুষ আলাদা।

পন্থক একটু গম্ভীর হয়ে বলে,—তুমি জান না মধুশ্রী। কোনদিন হয়তো সত্যিই আমাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে।

—সেটা তবে আমি মরলে।

—তুমি কি যে কোন সময়ে মরতে পার না?

—কি যে বলো!

পন্থক অন্য মানুষ হয়ে গেছে।—তুমি জান মধুশ্রী, যে কোন মানুষ যে কোন সময়ে মরতে পারে। তুমি মরতে পার, আমি মরতে পারি, সবাই। তবু আমাদের কত তৃষ্ণা, কত আশা!

পন্থকের ভাবান্তরে মধুশ্রী একটু ভয় পায়, তবু হেসে বলে,—বিহারে গিয়ে উপদেশ দিও, এখানে নয়। আমার ভিক্ষুণী হবার বাসনা নেই।

—তুমি যে ভিক্ষুণী হবে না, এমন কথা জোর করে বলতে পার না।

—পারি। ওসব কথা থাক। তোমাদের বাড়ি একদিন যাব।

—বেশ তো, এসো না।

—মা যেতে দিতে চায় না। তোমাদের বাড়ি তো মেয়েছেলে নেই।

—তা নেই।

—তোমার মা কি মরে গেছেন ?

—ঠিক জানি না।

—তার মানে ?

পঙ্কজের মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে,—তার মানে সত্যিই জানি না।

—তোমার দাদু কি বলেন ?

—দাদুও জানেন না।

—বড় অদ্ভুত তো! কি হয়েছে তার তোমরা কেউ জান না! তোমার বাবা ?

—তার কথাও জানি না। ও সব কথা থাক মধুশ্রী।

বলতে বলতে মধুশ্রীর কাছে এগোয় পঙ্কজ। চন্দনের স্নিগ্ধ গন্ধ পায় মধুশ্রীর গায়ে। ও বোঝে মধুশ্রী চন্দন বিলেপন করে স্নান করছে আজ। কত মসৃণ সুস্নিগ্ধ হাত দুখানি মধুশ্রীব।

ও বেশী সাজে না। অলঙ্কার পরে না। পরিষ্কার ঠাণ্ডা ওর শরীরটি। এইটেই ওর বৈশিষ্ট্য। বড় ভাল লাগে পঙ্কজের। ধনী শ্রেষ্ঠীকন্যাদের মত অলঙ্কারে ঝলমলিয়ে ওঠে না। সুশ্রী শান্ত ওর ভাবটি।

মধুশ্রী বলে,—তোমার দাদুর সব কিছুই তো তুমি পাবে ?

—হ্যাঁ, তা পাব।

—তবে তোমার আমার সঙ্গে এত না মেশাই ভাল।

—কেন ?

—আমরা দরিদ্র। তোমরা ধনী। এর ফল হয়তো ভাল হবে না।

পঙ্কজ একটু ভেবে বলে,—কি জান মধু, আমার মনে হয়, আমার বাবাও গরীব ছিলেন।

—কি করে জানলে ?

—কি জানি, এটা আমার মনের বিশ্বাস।

—হয়তো বা সেই জন্যেই তোমার মা সুখী হননি, এমনও তো হতে পারে ?

—না। তা হতে পারে না। আমার মনে হয় তাঁরা সুখী ছিলেন।

—তবে—?

—তবে কেন যে তাঁদের খোঁজ নেই বুঝে উঠতে পারি নে।

মধুশ্রী ও কথা এড়িয়ে বলে,—যাই, তোমার জন্যে জল নিয়ে আসি।

পঙ্কজ হাসে,—থাক, তৃষ্ণা মিটে গেছে।

—কি করে ?

—মধু পান করে।

মধুশ্রী রাঙা হয়ে ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পঙ্কজ মনে মনে হাসে। ও স্থির প্রতিজ্ঞা করেছে, বিবাহ যদি করতে হয়, তবে মধুশ্রীকেই বিবাহ করবে। আর কাউকে নয়। বৈশালীর অনেক প্রাসাদে তার আনা-গোনা আছে। বিরূঢ়কের অঢেল সম্পদের মালিক একমাত্র সে-ই হবে জেনে অনেক শ্রেষ্ঠী তাকে সুনজরে দেখে, খাতির করে। নজরটা সকলেরই তার সম্পদের ওপর। এইটেই তার সবচেয়ে খারাপ লাগে।

মধুশ্রীর মনোভাব উল্‌টো। সে সম্পদের লোভী তো নয়ই, বরং মাঝে মাঝে ওই জন্যেই তাকে এড়িয়ে চলতে চায়।

মধুশ্রীর পিতার রোজগার সামান্যই। অধ্যাপনাতে আর কত অর্থ উপার্জন করা যায় ? তাছাড়া সংসারটি বড়। ওর বড় বোনের বিবাহ হয়ে গেছে। বড় ভাই বিদেশে থাকেন উপার্জনের

জন্তে। তিনিও অধ্যপনাই করেন। এখানে তিন ভাই, এক বোন।

অনিরুদ্ধ আর মধুশ্রী সবচেয়ে ছোট।

পন্থককে ওরা বাড়ির ছেলের মতই দেখে। বিশেষ করে অধ্যাপক-গৃহিণী ওকে সন্তানের মত স্নেহ করেন। তিনি শুনেছেন, ওর মা নেই, তাই স্নেহটা হয়তো ওঁর পন্থকের ওপর একটু বেশী।

পরমান্ন, পলান্ন, বাড়িতে যখনই বিশেষ কোন খাদ্য প্রস্তুত করেন, অনিরুদ্ধকে দিয়ে পন্থককে ডেকে পাঠান। নিজে যত্ন করে ওকে খাওয়ান।

ঘরে তো ওর মা নেই, কোন মেয়েছেলেও নেই। যত্ন করে খাওয়াবার মত পন্থকের কে-ই বা আছে? অধ্যাপক-গৃহিণীর স্নেহের স্পর্শ পন্থক বেশ অনুভব কবে, খুশিও হয়। বার বার ভাবে, এ বাড়ির সঙ্গে তার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক পাতাতে হবে। সেটা মধুশ্রীকে বিবাহ করলেই সম্ভব হবে। মধুশ্রী তার প্রতি অনুরক্ত সে জানে। তাই বাধা বিশেষ কিছু নেই।

অধ্যাপক-গৃহিণীর মনের ইচ্ছেটাও অনেকটা ওই রকমই। তবে মুখে তিনি এখনও পর্যন্ত কিছু বলেন নি। অধ্যাপকের কাছেও কথা পাড়েন নি। জানেন যে অধ্যাপক এত সরল মানুষ যে, হয়তো পন্থককে ডেকে জিজ্ঞাসা করে বসবেন সব কথা।

সকলেই অপেক্ষা করছে। পন্থকও অপেক্ষা করছে। একটা সুযোগ বুঝে কথাটা সে-ই পাড়বে।

এমনি করে আরও কিছুদিন কাটে। পন্থক একটু অস্থির হয়ে উঠেছে। তার অধ্যয়নের সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। অধ্যাপক নিজেই পরীক্ষা করে তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে লিখে দিয়েছেন একটি কাষ্ঠফলকে।

এর পর কি অধ্যয়ন করতে হবে সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন আর দিন কতক। তারপর তার আর অধ্যয়নের জন্যে আসবার প্রয়োজন হবে না।

হয়তো বা বিরূঢ়ক তাকে বাণিজ্য করতে পাঠাবে মাঝে মাঝে। বিরূঢ়কের ব্যবসায়ে তাকে এইবার প্রবেশ করতে হবে। বিরূঢ়ক তাকে সে কথা বলেই রেখেছে। কতদিনই বা সে বাঁচবে। পন্থক যেন এইবার সব দেখে শুনে নেয়।

এইটেই পন্থকের একেবারে ভাল লাগছে না। ব্যবসায় কড়া-ক্রান্তির হিসাব শুনলেই তার মাথা ধরে যায়। সবচেয়ে খারাপ লাগে ওর হিসেব। কত বোকা হলে মানুষ হিসেব করতে চায়। জীবনের হিসেব করতেই হয়তো পারল না আজীবন, শুধু আশী কড়ায় এক তাম্রকাহন, আটারো শত কড়ায় এক রৌপ্যকাহন, এই হিসেব করতে করতেই দিন কাটিয়ে দিল। কত মূর্খ এই শ্রেষ্ঠীরা। কত দয়ার পাত্র!

পন্থকের মনের গঠনটা ব্যবসার উপযোগী মোটেই নয়, সেটা বিরূঢ়কও বোঝে। কিন্তু পন্থককে সব না বুঝিয়ে দিতে পারলে তারই বা উপায় কি? বিরূঢ়ক তাই বার বার তাকে চাপ দিতে থাকে। পন্থক ভাবে কি করবে সে। হয়তো বা ব্যবসাতে যোগদান করতেই হবে। তখন হয়তো হিসেবের চাপে এখানে আসবার আর সময় পাবে না। তাছাড়া অধ্যয়ন শেষ হয়ে গেলে এখানে খুব বেশী আসাটা ভাল দেখাবে না। কি করা যায়?

মধুশ্রীকে বলেছিল,—এখানে আসা তো বন্ধ হবে এবার।

মধুশ্রীও ভাবিত। মুখটা নীচু করে বললে,—জানি।

—কি করা যায় বলো তো?

ম্লান হেসে বলে মধুশ্রী,—কি আবার করা যাবে।

—তোমাকে না দেখে কি করে থাকব?

—ছোটবেলা থেকেই কি আমায় দেখছ? তখন যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে।

—ছোটবেলার সঙ্গে এখন যে অনেক প্রভেদ মধু!

মধুশ্রী কথা বলে না। কি-ই বা বলবে?

—তোমার বাবাকে বলব?

—সে তোমার ইচ্ছে।

—তুমি বরং তোমার মাকে বলো না?

—না। আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার বিয়ের জন্যে চেষ্টাও যখন চলছে, তখন কি করে আমি বলি। তোমার দাদুর মত আছে? আমরা তো গরীব।

—তোমার ওই এক কথা। গরীব হলে কি-ই বা আসে যায়! দাদুর মত হয়ে যাবে।

পঙ্কক চুপ করে ভাবতে থাকে। কি করা যায়, কি করে বলা যায়?

মধুশ্রী কথা বলে না। ধীরে ধীরে চলে যায় ওর কাছ থেকে। মধুশ্রী বড় শান্ত। পঙ্কক জানে, ওকে যদি বাড়ি থেকে অন্য কোথাও বিয়েও দেয়, মধুশ্রী নীরবে সে বিয়ে মেনে নেবে। মন তার ভেঙে গেলেও মুখ ভাঙবে না, প্রতিবাদ জানা যাবে না।

এইটেই পঙ্ককের সবচেয়ে ভাববার কথা।

দু'চার দিনের ভেতরেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সমাধান করেন অধ্যাপক নিজে। অধ্যাপক-গৃহিণী নিশ্চয়ই বলেছিলেন তাঁকে সব কথা। তিনিও বুঝেছিলেন, এই সময়েই পঙ্কককে বিয়ে করতে হবে। তা নইলে এ বাড়িতে বেশী না এলে, বা ব্যবসায় কাজ শুরু করলে পঙ্ককের মনের পরিবর্তন হতে পারে।

শেষ দিন সন্ধ্যায় অধ্যাপক ডাকলেন পন্থককে। পন্থকও সেদিন অতি চিন্তিত। মধুশ্রীর সাক্ষাত পাওয়া যাচ্ছে না। সে বোধহয় কোন ঘরে বা গবাক্ষপ্রান্তে লুকিয়ে আছে। শেষ দেখা করতে সে চায় না পন্থকের সঙ্গে। হয়তো আবেগ সংযত করতে পারবে না এই ভয়ে।

অধ্যাপক ডাকলেন পন্থককে।

পন্থক এসে বলল,—আমাকে কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা অন্য কথা ছিল। দেখো, সরল হবার শিক্ষাই এতদিন তোমাকে দিয়েছি। তাই আমি যদি আজ সরল না হই, তবে সে শিক্ষা তোমার সম্পূর্ণ হবে কি করে ? একটা কথা তোমায় সহজভাবে জিজ্ঞেস করব।

—বলুন।

—তুমি কি মধুশ্রীর প্রতি অনুরক্ত ?

পন্থক মুখটা নীচু করে বসে থাকে।

অধ্যাপক বলেন,—বেশ, তা যদি হয়, তবে তোমার স্বীকার করতে সংকোচ করা উচিত নয়। সংকোচ থেকে সংসারে বহু ভুলের সূত্রপাত হয়।

পন্থক মুখ নীচু করে আস্তে আস্তে বলে,—আপনার অনুমান সত্য। সত্যাশ্রয়ী আপনি। আপনার অনুমান মিথ্যা হতে পারে না।

অধ্যাপক খুশি হলেন। বললেন,—তুমি কি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছো ?

—সর্বদাই প্রস্তুত আছি। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে নেব।

—আমার এতে আনন্দই হচ্ছে। তুমি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সৎ। মধুশ্রী সুপাত্রেই পড়বে।

পন্থক চুপ করে বসে থাকে।

অধ্যাপক একটু চিন্তা করে বলেন,—একটা কথা। তোমার মাতামহের মতামত জানা দরকার। তাঁর সঙ্গে সামাজিক কিছু কথা হওয়া প্রয়োজন।

—আপনি কি আজ্ঞা করেন?

—আমি বলি, তুমি তোমার মাতামহকে আজ গিয়ে বোলো যে কাল সন্ধ্যায় আমি তাঁর কাছে যাব। তিনি যেন গৃহে থাকেন। অবশ্য তাঁর যদি খুব অসুবিধা থাকে, তুমি আমাকে খবর দিও।

পন্থক উঠে অধ্যাপককে প্রণাম করে। অধ্যাপক আশীর্বাদ করেন।

ভেতরে আসে পন্থক। অধ্যাপক-গৃহিণীর কাছে এসে তাঁকেও প্রণাম করে। অধ্যাপক-গৃহিণী আড়াল থেকে সব শুনেছিলেন। তিনি পন্থকের মুখচুম্বন করে আশীর্বাদ করেন,—দীর্ঘজীবি হও বাবা!

পন্থক ওখান থেকে চলে আসে। সে খোঁজে মধুশ্রীকে। মধুশ্রী কোথায় গেল? দ্বিভূমিক গৃহের দোতলায় উঠে আসে পন্থক। দোতলায় স্বল্পপরিসর একটি ঘরে চুপ করে বসে আছে মধুশ্রী।

মুখ তার ম্লান। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

পন্থক কাছে আসে।

চিন্তায় নিমগ্ন মধুশ্রী কিছু টের পায় না।

—মধু!

—কে?

চমকে ওঠে মধুশ্রী। তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বেরিয়ে আসতে চায়। পন্থকের সঙ্গে আজ ও কোন কথা বলতে চায় না। কোন বিদায় সম্ভাষণ নয়।

—শোন। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

নির্বাক মধুশ্রী একটু দাঁড়ায়।

—তোমার বাবার সঙ্গে কথা হলো।

মধুশ্রী এতক্ষণে তাকায় পন্থকের দিকে। কৌতূহল দমন করবার চেষ্টা করে।

পন্থক বলে,—তিনি কাল আমার দাদুর কাছে যাবেন। গিয়ে পাকা কথা বলে আসবেন।

মধুশ্রী কাছে আসে। অকস্মাৎ আনন্দে ওর চোখ জলে ভরে উঠেছে। বড় শান্ত মেয়ে।

—তোমার বাবা খুব খুশি হয়েছেন। রাজী হয়েছেন সানন্দে।

পন্থক মধুশ্রীর কাছে এসে এতদিন পরে ওকে স্পর্শ করে। ওর হাত ধরে। এতকাল পন্থক কখনও মধুশ্রীর গায়ে হাত দেয়নি।

মধুশ্রী বাধা দেয় না। হাতখানা ওর কাঁপে।

—আর শীঘ্র আমি আসব না মধু। কথা পাকা হয়ে গেলে আসাটা ঠিক হবে না।

মধুশ্রী কথা বলে এতক্ষণে,—আমার কিন্তু ভয় করছে।

—ভয়? কেন?

—কি জানি। তুমি কাল সন্ধ্যার পর একবার এসো।

—কেন?

—কি কথা হলো বলে যেও।

পন্থক হাসে।

—বেশ, তাই আসব। তুমি বরং এখানেই অপেক্ষা কোরো আমার জন্যে।

মধুশ্রী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

পন্থক ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে,—অনিরুদ্ধ কোথায়?

—জানিনে তো।

—ও এলে বোলো, কাল দুপুরে ও যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

—বলব।

—আচ্ছা, অনিরুদ্ধ কি আমাদের বিয়েতে খুশি হবে।

—তা নিশ্চয়ই হবে।

পন্থক এবারে নীচে নেমে আসে। গৃহ থেকে বেরিয়ে পথে নামে। বৈশালীর সুপ্রশস্ত পথের দুপাশে বৃক্ষসারি। কোথাও কোথাও উদ্যানের শোভা। পথের ধারে ধারে বর্তিকা আর প্রহরী।

বৃক্ষের পাতা বাতাসে নড়ে। ঝিরঝির করে সুন্দর একটি শব্দ কানে আসে। পন্থক প্রায় নাচতে নাচতে পথ চলে। দেহ-মন আজ বড় হালকা। সবই সুন্দর লাগছে আজ।

তাদের প্রাসাদে তার শয়নকক্ষে একটি সুবর্ণখচিত সপ্তস্বরা আছে। ও শুনেছে সেটি তার মায়ের ছিল। বিবাহের পরে ওই সপ্তস্বরাটি সে মধুশ্রীকে উপহার দেবে। মায়ের হয়ে সে তার স্ত্রীকে ওই একটিমাত্র উপহার দেবে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্রাসাদে পোঁছোয় পন্থক।

রাত্রে আহারে বসে বিরূঢ়ককে বলে,—কাল অধ্যাপকমশাই তোমার কাছে একবার আসবে দাদু।

—কেন? তাঁর কি কিছু প্রাপ্য আছে?

—বোধহয় না। কেন আসবে ঠিক বলতে পারছিনে।

—তোমাকে কিছু বলেননি?

—না। বলেছেন, তোমাকে কাল সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকতে।

—কাল সন্ধ্যায়?

—হ্যাঁ।

বিরূঢ়ক ঠিক বুঝতে পারে না কেন অধ্যাপক তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। একটু ভেবে বলে,—কাল আমাকে বিহারে যেতে হবে।

—না হয় একটু পরে যেও।

—বেশ একটু পরেই না হয় যাব।—বিরূঢ়ক বলে,—জান, আগামী পরশু ভগবান বুদ্ধ আসছেন মহাবিহারে। এখানে থাকবেন কিছুদিন। রাজা প্রসেনজিৎ নগর সজ্জিত করবার আদেশ দিয়েছেন।

—শুনেছি।

—তাই কাল বিহারে আমাকে যেতেই হবে। কিছু অর্থ আমাকেও দিতে হবে এই উপলক্ষে। কত দিই বলো তো?

—তোমার যা ইচ্ছে।

—ভাবছি পাঁচশ সুবর্ণ দেব এবার।

—তাই দাও।

বিরূঢ়ক আর কথা বলে না। মনে মনে বুদ্ধের আগমন প্রতীক্ষার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যায়। আহার সেরে উঠে পড়ে। পন্থকও কথা বলে না। মধুশ্রীর চিন্তায় মগ্ন সে।

পরদিন সন্ধ্যার একটু পূর্বেই এলেন অধ্যাপক। একাই এলেন। অপেক্ষা করছিল পন্থক। বিরূঢ়কও বাড়ি ছিল। পন্থক তাকে পথে দেখে খবর দিল বিরূঢ়ককে। ঘরে শুয়ে ছিল বিরূঢ়ক। দুপুরে ধর্মগ্রন্থ পাঠের পর বিশ্রাম করছিল। পন্থকের কাছে অধ্যাপক আসছেন শুনে উঠে এল।

পন্থক নিম্নভূমিতে নেমে গিয়ে ভেতরে নিয়ে এল অধ্যাপককে।

পাশেই একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে সজ্জিত ফলকাসনে বসাল তাঁকে।

বিরূঢ়ক নেমে এলো।

অধ্যাপক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করলেন। বিরূঢ়ক প্রত্যাভিবাদন করে বসল সেই ফলকাসনে তাঁর পাশে। পন্থক ভেতরে চলে গেল অধ্যাপকের জলখাবারের জোগাড় করতে।

বিরূঢ়ক প্রথম কথা বলল,—শুনেছি আপনি আজ আসবেন। আমার গৃহে পায়ের ধুলো দিয়েছেন এ আমার সৌভাগ্য। আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পারি ?

অধ্যাপক ভাল ভাবে বসেন। একটু কেশে বলেন,—আমারও সৌভাগ্য আপনার সাক্ষাত লাভ ঘটল। নগরে আপনার যথেষ্ট সুনাম শুনেছি। বিশেষ করে আপনার দানের কথা কে না জানে।

—কি আর দান করতে পারি বলুন। সবই শাস্তার ইচ্ছায় হয়ে থাকে।

অধ্যাপক বিনীত ভাবে বলেন,—আজ একটি আবেদন নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

—আপনি পন্থকের শিক্ষাগুরু। আপনাকে অদেয় কি থাকতে পারে ? এর জন্যে আবেদনের প্রয়োজন নেই। বলুন আপনার কি প্রয়োজন ?

অধ্যাপক একটু ভেবে ধীরে ধীরে বলেন,—আমার ধৃষ্টতা যদি কিছু হয় মার্জনা করবেন। আমি পন্থকের কথাই বলছিলাম।

—বলুন।

—আমি ঠিক কিছু চাইতে আসিনি। আপনি যদি দয়া করে গ্রহণ করেন তবেই কৃতার্থ হবো।

—কি এমন দ্রব্য যা গ্রহণ করতে হবে ?

—আমার কন্যাকে আপনার সংসারে স্থান দিতে হবে।

বিরূঢ়ক একটু চমকে ওঠে। লোল চর্মের ভেতর দিয়ে তাকায় অধ্যাপকের দিকে।

আস্তে আস্তে বলে,—আপনার কন্যা ?

—হ্যাঁ, আমার কন্যা আপনার দৌহিত্রের প্রতি অনুরক্ত। তাদের বিবাহ হোক এইটি আমার আবেদন।

—বিবাহ !

বিরূঢ়কের গলায় আটকে যায় শব্দটা। অধ্যাপকের কথায় যেন ভয় পেয়ে গেছে সে। ভয় কিসের ?

অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

দরজার আড়ালে পন্থক দাঁড়িয়ে আছে। তারও বুকটা কাঁপছে। দাত্থ কি শেষকালে অমত করে বসবে ? অমত করবে কেন ? কি কারণ থাকতে পারে ? ওরা দরিদ্র বলে ? তা যদি হয় সে এখনি ঘরে ঢুকে দাত্থকে বলবে, দরিদ্রের কন্যা ছাড়া সে আর কাউকে বিয়ে করবে না।

পন্থক দাঁড়িয়ে থাকে। এখনি সে ঢুকবে না। পরে ঢুকবে। দাত্থ কি বলে শুনে নিক আগে।

বিরূঢ়ক স্থির হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

অধ্যাপক বিরূঢ়কের দিকে তাকিয়ে থেকে বিস্মিত হন। তারপর কিছুটা নিরাশ হয়ে বলেন,—আপনার তবে মত নেই। আমার কন্যা শিক্ষিতা, সুন্দরী, অতি শান্ত স্বভাব তার।

বিরূঢ়ক নীরব।

পন্থক বাইরে দাঁড়িয়ে বিরূঢ়কের কথা শোনবার জন্যে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করে।

অধ্যাপক আবার বলেন,—পন্থক ওর প্রতি অনুরক্ত। আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে আমি দরিদ্র। অলঙ্কার প্রচুর দিতে পারব না।

বিরূঢ়ক তবু নীরব।

অধ্যাপক অপেক্ষা করেন উত্তরের।

ঘরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিরূঢ়কের গম্ভীর বিষণ্ণ কণ্ঠ শোনা যায়।—অমত আমার নেই। বরং আমার দিক থেকে আনন্দের কথা।

বাইরে দাঁড়িয়ে পন্থক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

—কিন্তু—থেমে বিরূঢ়ক বলে,—অমত আপনারই হবে।

—আমার!—অধ্যাপক বিস্ময়ে বলে ওঠেন।

—হ্যাঁ, আপনার।

—কি বলছেন আপনি! পন্থকের মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক কটা দেখা যায়? তাছাড়া আপনার মত স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠীর ঘরে আমার কন্যা আসবে, এতে আমার অমত হতে যাবে কেন?

—হবে, অমত হবে। আপনি সব কথা জানেন না।

—তার মানে? কি কথা?

—দেখুন, আমি পঞ্চশীল পালন করবার চেষ্টা করি। তাই মিথ্যে বলে এ বিয়ে দিতে পারব না। সত্য কথা আমাকে বলতেই হবে। তারপর যদি আপনার মত হয়, তবেই এ বিয়ে হবে।

—বলুন।

বিরূঢ়কের কণ্ঠ কাঁপে।—পন্থক আজ পর্যন্ত জানে না ওর বাবা কে ছিল? আপনি জানেন?

—আমি? না, জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি আপনার কন্যার বিবাহ নিশ্চয়ই ভাল ঘরে দিয়েছিলেন। শুনেছিলাম বিয়েটা নাকি হঠাৎ হয়েছিল।

—ওটা নগরের জনরব। আমার কন্যার বিবাহ হয়নি।

—বলেন কি?

বাইরে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে শুনছে পন্থক।

কম্পিত কণ্ঠে বিরূঢ়ক বলে,—ঠিকই বলছি। আমার কন্যা আমার গৃহের একটি ক্রীতদাসের সঙ্গে পলায়ন করেছিল। সেই কুকুরটার নাম উপালী।

বাইরে দাঁড়িয়ে পন্থকের মাথাটা ঝিম ঝিম করে। এ কি শুনছে সে। তার বাবা ক্রীতদাস!

অধ্যাপক স্তম্ভিত হয়ে বসে আছেন।

ঘরের বাতাস থম থম করছে। বিরূঢ়ক চোখের জল মুছে

বলে,—তারা কোথায় ছিল আমি জানিনে। একদিন আমার কন্যা ভিখারিণীর মত এসে এই ছেলেটিকে আমার কাছে দিয়ে গেল। আমি কন্যাকে গৃহে আশ্রয় দিতে সাহস করলাম না। তাড়িয়ে দিলাম, অতি দীন ভিখারিণীর মত সে চলে গেল।

অধ্যাপক বিস্ময়ে বলে ফেলেন,—তবে পন্থক জারজ।

—জারজ।—বিরূঢ়ক প্রতিধ্বনি করে।

জারজ সন্তান সে? বাইরে দাঁড়িয়ে পন্থক কাঁপছে থর থর করে। শক্তিমান যুবক দুর্বল ভীরুর মত কাঁপছে। জারজ! একটি মাত্র কথা সংসারের সব ওলট পালট করে দিল। সমস্ত পৃথিবীটা চোখের সামনে ঘুরছে। পাক খাচ্ছে অনবরত। পন্থক জারজ।

বিরূঢ়ক পাষাণের মত বসে আছে।

অধ্যাপক মুখ নীচু করে বসে আছেন। অমন শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক। সে ক্রীতদাস সন্তান! অবিবাহিত মায়ের পুত্র! জারজ!

অধ্যাপক নিজেও যেন বেদনায় নীচু হয়ে রইলেন। পন্থককে ভালবাসতেন তিনি। সন্তানের মতই ভালবাসতেন।

বিরূঢ়ক আর কথা বলে না। আর কি বলবার আছে!

অধ্যাপক ওঠেন।—আজ উঠি তাহলে।

বিরূঢ়ক বলে,—একটা অনুরোধ। কথাটা আর কাউকে বলবেন না। পন্থককে কখনও বলবেন না।

বাইরে দাঁড়িয়ে অনেক কাঁপুনির পর স্থির হয়ে গেছে পন্থক। সংসারে তার আজ কোন স্থান নেই। জারজ সন্তানের সমাজে কি স্থান থাকতে পারে! শুধু মনে হচ্ছে তার এ পরিচয় যদি সে আগে জানত, তবে হয়ত মধুশ্রীর জীবনটা এমন করে মাটি করত না।

আর একটি কথা পন্থক জানল যে তার মা ছিলেন সাহসিনী, তার বাবা ছিলেন বীর। সমাজে এত বড় দুঃসাহসের কাজ করে

তারা অমর হয়ে রইলেন। প্রেমের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত তার মা আর বাবা। ঠিকই করেছেন তাঁরা। কিছুমাত্র অপরাধ করেননি। আজ মাকে পেলে সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলত,—মা তুমি ভ্রষ্টা নও, তুমি কলঙ্কিনী নও, তুমি আমার মা। আমি তোমাকে ঘৃণা করিনা। সমস্ত সংসার তোমাকে ঘৃণা করলেও তুমি আমার মা। কোথায় তার মা? বিরূঢ়ক তাঁকে কুকুরের মত বিতাড়িত করেছিল।

দাদু ভীরু। নিষ্ঠুর। অতি সাধারণ জীব মাত্র।

মা কি আজও বেঁচে আছে? তাব জন্মের জন্য হয়ত মায়ের লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। কলঙ্কের সীমা ছিল না। তবু তাকে বাঁচাবার জন্যে আবার এসেছিল মা এই পিতার কাছে ভিক্ষা চাইতে। বিতাড়িত হলো!

পন্থকের রক্তিম গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

ধীরে ধীরে নড়ে ওঠে পন্থক। আর নয়। এবার তার পথ তাকে দেখতে হবে। তাকে ডাকছে। ডাক সে শুনতে পেয়েছে। ওই আলোকময় পুরুষ তাকে ডাকছে, আয়! আয়! কে বললে তুই জারজ, তুই অমৃতের সন্তান। আয় আমার কোলে আয়।

তোর জন্ম মধুশ্রীকে বিবাহের জন্য নয়। তোর এ জন্মের অনেক বড় মানে আছে। অনেক বড় উদ্দেশ্য আছে।

পন্থক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাকে। স্পষ্ট ডাক শুনতে পাচ্ছে।

আস্তে আস্তে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল পন্থক। তার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ। সেই প্রশান্তির প্রতিমূর্তি।

বাইরে বেরিয়ে এলেন অধ্যাপক। পিছনে পিছনে বিরূঢ়ক।

বিরূঢ়ক বলল,—পন্থক আপনাকে পৌছে দিয়ে আসুক।

অধ্যাপক আপত্তি করলেন না। এ সব কথা শোনবার পর শরীর তাঁর দুর্বল লাগছিল।

বিরূঢ়ক ভেতরে গেলেন পন্থকের খোঁজে।

—পন্থক !

কোথায় পন্থক ! কোথাও নেই পন্থক। দাস-দাসীদের জিজ্ঞেস করল। কেউ জানে না পন্থক কোথায় গেছে। একজন বললে, সে পন্থককে একটু আগে এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

তবে পন্থক নিশ্চয় সব শুনেছে। সর্বনাশ হয়ে গেছে !

বিরূঢ়ক বসে পড়ল।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে ! আমাদের কথা পন্থক সব শুনেছে। সে চলে গেছে।

বিরূঢ়ক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। এত বড় আঘাত সইতে পারল না। দাস-দাসীরা তাকে ধরে কক্ষে এনে শুইয়ে দিল। অধ্যাপক তার পাশে বসে পরিচর্যা করতে লাগলেন।

সাতদিন কেটে গেছে। সাতদিন যেন বিরূঢ়কে কাছে সাত যুগ। দিবারাত্র পন্থকের প্রতীক্ষা করছে বৃদ্ধ। পন্থকও যদি পটাচারার মত চিরদিনের জন্যে চলে যায়। তবে কি করে আর বাঁচবে বিরূঢ়ক ? বেঁচে আর কি লাভ ?

শেষ আঘাত যে এত বড় আঘাত হবে বিরূঢ়ক কখনও ধারণা করতে পারেনি। ভেবেছিল পন্থককে নিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে, ভুলেও গিয়েছিল সব শোক, সব দুঃখ। পন্থকও যে এই বয়েসে এত বড় আঘাত দিয়ে যাবে, এ কথা জানলে বিরূঢ়ক সেদিন এ শিশুকে পটাচারার কাছ থেকে গ্রহণ করত না। প্রত্যাখ্যান করত। ফিরিয়ে দিত।

পূর্বজন্মের কোন পাপে যে সে এমন করে বার বার আঘাত পাচ্ছে, সে শুধু শাস্তাই বলতে পারেন, শাস্তার কাছে যেতে হবে তাকে। শাস্তাই এ আঘাতের একমাত্র প্রলেপ, একমাত্র শান্তি।

বৈশালীর পথ ঘাট কলরবে ভরে গেছে। ভিক্ষুদের আনা-গোনায় মুখর হয়ে উঠেছে বৈশালী। ভগবান বুদ্ধ কয়েকদিন হলো বৈশালীতে এসেছেন। বিরূঢ়ক এ পর্যন্ত যেতে পারেনি তাঁর কাছে। সন্ধ্যায় উপস্থানশালায় ভগবান বুদ্ধ উপদেশ দেন, সেখানে একদিনও যাওয়া হয়নি।

আজ যাবে। আজ বিরূঢ়ক উঠে চলতে পারছে। আজ যাবে।

একটু আগে অধ্যাপক এসেছিলেন। অধ্যাপক এর ভেতর দুএকদিন অন্তর এসেছেন।

একদিন বলছিলেন বিরূঢ়ককে,—আপনার বেদনা আমি বুঝি শ্রেষ্ঠী মহাশয়। এ বেদনার জন্যে কিন্তু দায়ী আপনি।

—আমি ?

—হ্যাঁ, আপনি। আপনি আপনার কন্যাকে বিতাড়িত করে সমাজের কাছে সুখে বাঁচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মানুষ হিসেবে অন্যায় করেছিলেন।

—অন্যায় করেছিলাম।

—হ্যাঁ, অন্যায় করেছিলেন। আমি আমার কন্যা হলে বুকে তুলে নিতাম। সেই ক্রীতদাসকেও গ্রহণ করতাম জামাতার মত।

বিরূঢ়ক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় অধ্যাপকের দিকে।—কি বলছেন আপনি !

—ঠিকই বলছি। অধ্যাপকের কণ্ঠে সুদৃঢ় স্বর।—ঠিকই বলছি। আর এ কথাও আজ আপনাকে বলছি যে এই বৈশালীর বুকে বসে আমার কন্যার বিবাহ আমি পন্থকের সঙ্গে দেব বলে স্থির করেছি। পন্থক মানুষ—এই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

বিরূঢ়ক অবাক হলো। বেশী অধ্যয়ন করে অধ্যাপকের মস্তিষ্কের গোলমাল হয়নি তো ?

—এত বড় দুঃসাহসের পরিণাম জানেন ?

—জানি, সমাজ থেকে আমাকে বিতাড়িত করবে। সান্ত্বনা থাকবে, আমি সমাজের যন্ত্র নই, আমি মানুষ।

বিরূঢ়ক অধ্যাপকের হাত ধরে। আস্তে আস্তে বিরূঢ়ক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,—আপনি আমার নতুন চোখ খুলে দিলেন। আমার বহুকালের ভয়ের প্রাচীর ভেঙ্গে দিলেন।

—শুধু তাই নয়। সমাজের এই বিষয়ে আমি একটি অনুশাসন রচনা করে কোশলরাজ প্রসেনজিতকে দেখাব বলে স্থির করেছি।

বিরূঢ়ক বলে,—কিন্তু পন্থক কোথায় গেল বলুন তো ?

—তাই তো ভাবছি। যদি সে ফেরে, তবে তার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ আমি দেবই। ততদিন আমার কন্যা অবিবাহিতা থাকবে।

বিরূঢ়কের চোখ দিয়ে জল প'ড়ে গালের লোলচর্ম ভেসে গেল।

আজ সপ্তম দিবসে বিরূঢ়ক মহাবিহারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। বৌদ্ধ মহাবিহার। অনেক খোঁজ করেও পন্থকের কোন ঠিকানা না পেয়ে বিরূঢ়ক ভিক্ষুসংঘে যাওয়া স্থির করেছে। শরীর দুর্বল। তবু আজই যেতে হবে। ঘরে আর কোন মতেই শান্তি পাচ্ছে না বিরূঢ়ক। একটি দাস সঙ্গে নিয়ে মহাবিহারের দিকে চলে বিরূঢ়ক।

বিশাল কাননের ভেতরে বিহার। বিহারের কক্ষ সংখ্যা এত বেশী যে গুণে শেষ করা যায় না। বিহারের ভেতরে ঢুকে সোজা উপস্থানশালার দিকে যায় বিরূঢ়ক।

উপস্থানশালায় তিল ধারণের স্থান নেই। পিছনে গৃহস্থ। সম্মুখে ভিক্ষুরা। বহু ভিক্ষু নতুন এসেছে এখানে শাস্তার সঙ্গে।

শ্রাবস্তী থেকে মগধ থেকে স্বনামধন্য সাধনাসিদ্ধ বহু অর্হত্তের আগমন হয়েছে। সকলেই নীরবে বসে আছে।

উপস্থানশালার শেষ প্রান্তে আসন। মহাআসন। সেখানে ধীরে ধীরে এলেন জ্যোতির্ময় পুরুষ ভগবান তথাগত।

বিরূঢ়কের প্রাণের জ্বালা যেন অনেক শান্ত হয়ে এলো। এ ব্রহ্মাণ্ডের সব শান্তি যেন জমাট বেঁধে মূর্তি ধরে এসেছে। কি গভীর অতল প্রশান্তি! বিরূঢ়কের চোখে জল আসে।

চোখের জল মুছে তাকায় চারদিকে। ভগবান বুদ্ধ আজ কাকে পাশে নিয়ে বসেছেন, কে ওই মুণ্ডিত মস্তক গৌরকান্তি ভিক্ষু?

ভগবান তার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসছেন। গৌরকান্তি যুবক যে তারই পন্থক?

ফিস ফিস করে ওঠে বিরূঢ়ক,—পন্থক!

পন্থক। নিশ্চয়ই ও পন্থক। তার ভুল হচ্ছে না তো? পন্থককে ভাবতে ভাবতে ভুল দেখছে না তো?

বিরূঢ়ক উঠে পড়ে। একটু এগিয়ে একটি ভিক্ষুকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে,—ও কে?

—কে?

—ওই যে ভগবানের পাশে বসে যুবক ভিক্ষু।

ভিক্ষুটি হাসে।—উনি নতুন এসেছেন। কদিন আগে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ভগবান ওঁকে খুব স্নেহ করছেন দেখছি। প্রথম দিন থেকেই ভগবানের সুনজরে পড়েছেন।

বিরূঢ়ক অস্থির হয়ে ওঠে।—ওর নাম জানেন?

—নাম পন্থক। প্রব্রজ্যা দিয়ে ভগবান ওঁকে মহাপন্থক বলে আহ্বান করেছেন।

—পন্থক!—বিরূঢ়ক স্থির হয়ে দাঁড়ায়। মুহূর্তে ওর সব অস্থিরতা কেটে গিয়ে গভীর আনন্দে দেহ মন পুলকিত হয়।

তার পন্থক আজ শাস্তার প্রিয় ভক্ত। তার পন্থক আজ নির্বাণ লাভের আশায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে।

এর চেয়ে আরও বেশী আনন্দ সংসারে আছে কিনা সন্দেহ।

দরদর করে চোখের জল পড়ে বিরূঢ়কের গাল বেয়ে। বিরূঢ়ক আজ ধন্য। সেই ক্রীতদাস ধন্য হয়ে গেল এমন পুত্রের পিতা হয়ে। বিরূঢ়ক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পন্থক সেদিন বিরূঢ়কের প্রাসাদ থেকে সোজা চলে এসেছিল এই মহাবিহারে। সে যে নিজে ইচ্ছে করে এসেছিল তা নয়। তাকে পথ দেখিয়ে এনেছিল এই জ্যোতির্ময় পুরুষ। পন্থক কোন-দিকে তাকাতে পারছিল না। তার সামনে সে শুধু দেখছিল সেই আলোয় ভরা পুরুষকে। বিহারের দ্বারে এসে সে পুরুষ অন্তর্হিত হলেন।

এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। বড়ই বিস্ময়ের কাহিনী।

বিহারের রুদ্ধ দ্বাব খুলে গেল। একটি ভিক্ষু এসে তার সামনে দাঁড়ালেন।

—আপনি ভিতরে আসুন।

পন্থক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললে,—কেন? তিনি কই?

ভিক্ষু মধুর হেসে বললেন,—তিনি আপনাকে ডেকেছেন। তিনি আজই এখানে এসেছেন। এইমাত্র বললেন—দ্বারে একজন ভাগ্যবান যুবক এসেছে, তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে এসো। আপনি চলুন।

পন্থকের হাত ধরল ভিক্ষু। পন্থক ভেতরে চলল।

একটি কক্ষে নিয়ে গেল তাকে। সেখানে ভিক্ষু পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন একজন। এই তো সেই আলোয় ভরা পুরুষ! এই তো সেই।

তিনি হাসলেন। পৃথিবীর যত মাধুর্য যেন ঘনীভূত হয়েছে তাঁর হাসিতে।

—এসো। তুমি এসেছ?

পন্থক বিহ্বল বিস্ময়ে বলে,—আপনি তো আমাকে নিয়ে এলেন।

আবার হাসেন।—আমি নই। তোমার পূর্বজন্মের সুকৃতি তোমায় নিয়ে এসেছে। সে কথা তুমি জান না। আমি জানি। বহু ত্যাগের ভেতর দিয়ে পূর্বজন্মে আমাকে তুমি চেয়েছিলে।

পন্থক লুটিয়ে পড়ে।

তিনি ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত রাখেন।—জানি তুমি দুঃখ পেয়েছ। কিন্তু এই বেদনা থেকেই তোমার আনন্দের জন্ম হবে।

পন্থক যেন স্থির হয়ে যায়। আলোর ঢেউ তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখানে কেউ নেই। মধুশ্রী নেই, মা নেই, বাবা নেই। এ এক নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দের স্রোত। আলোর বন্যা।

পরদিন ভগবান বুদ্ধ তাকে নিজ হাতে প্রব্রজ্যা দিলেন। দশশীলে শিক্ষা দিলেন। দশপারমিতার সাধন করতে উপদেশ দিলেন। দান, শীল, প্রজ্ঞা, বীর্য আরও কত উপদেশ যে দিলেন!

আশ্চর্য এই যে প্রতিটি উপদেশই পন্থকের ধারণায় এলো। সে যেন এসব জানত। এইসবের জন্যই যেন সে এতদিন অপেক্ষা করছিল।

শাস্তা একজন ভিক্ষুকে আদেশ করলেন,—একে ত্রিচীবর আর অষ্টবস্তু দাও।

এ ভিক্ষুর নাম মহানাম।

ত্রিচীবর দেওয়া হোল তাকে। মুণ্ডিত মস্তকে ত্রিচীবর ধারণ করে অপূর্ব শোভা হলো তার। অষ্টবস্তু দিলেন সর্বদা সঙ্গে রাখতে। ত্রিচীবর ছাড়া ভিক্ষাপাত্র, কায়বন্ধন, সূচি, বাসি, ক্ষুর, পরিস্রাবন।

জল ছাঁকবার যন্ত্র পরিস্রাবন। ভিক্ষুরা জল না ছেঁকে পান করে না। করতে নেই।

তিন চার দিনের ভেতর অনেক শিক্ষা দিলেন তাকে মহানাম।

ভগবান তাকে ধ্যান প্রণালী বলে দিয়ে উপদেশ করলেন, ধ্যান করতে।

হেসে বললেন অন্য ভিক্ষুদের।—বেশী সময় লাগবে না। মহাপন্থক অতি সহজে অর্হত্ব লাভ করবে। ওর পূর্ব জন্মান্তরে অনেক কাজ করা আছে।

সত্যিই তাই। দিন কয়েকের ভেতর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যেতে লাগল পন্থক। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে মার্গ সুখের নাগাল পেতে লাগল।

অবাক হলো অন্যান্য ভিক্ষুরা।

শাস্তা তাকে বড় স্নেহ করেন। পন্থকের কথা সকাল সন্ধ্যায় জিজ্ঞাসা করেন তিনি। ওকে ডেকে কাছে বসান। গায়ে হাত দেন। সে স্পর্শে কেঁপে কেঁপে ওঠে পন্থক।

উপস্থানশালায় একদিন শাস্তা নিজের খুব কাছে বসাল পন্থককে। সকলেই বিস্মিত হয়। কেউ কেউ বা একটু ঈর্ষার ভাব আনে মনে। কিন্তু পরমুহূর্তে মন থেকে সরিয়ে দেয় সে ভাব। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে। নইলে শাস্তা একে এত স্নেহ করবেন কেন। নিশ্চয়ই ইনি মহাশক্তিধর। মহাপ্রজ্ঞাধর।

এই সামান্য কদিনে অন্য ভিক্ষুরাও ওকে সম্মান করতে থাকে।

পন্থকের দৃষ্টি তখন অন্য কোন দিকে নেই। সে শুধু শাস্তার

উপদেশ মুহূর্তের পর মুহূর্ত নিজের জীবনে বসিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

চোখের জল সে রোধ করতে পারে না, যখন সে ভাবে সে এক জারজ যুবক। তার ওপরে ভগবানের স্নেহের অবধি নেই। একটু ঘৃণা করা তো দূরের কথা, তাকেই যেন তিনি বেশি করে বড় আসনে বসাতে চাইছেন। এ তাঁর কি লীলা!

এ তাঁর পক্ষেই সম্ভব। মানুষের পক্ষে এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা সম্ভব নয়।

যেন বুকে টেনে নিলেন। আশ্রয় দিলেন। উন্নতি করলেন।

পন্থক কাঁদে।

ভগবান তথাগত তার কাছে এলেন। তার চোখে জল দেখে গম্ভীর হলেন। বললেন শুধু,—ভিক্ষুর পক্ষে ক্রন্দন সাধনের পথে অতি বিঘ্নকর। শোক থেকেই ক্রন্দনের জন্ম। মারের বশে যেও না।

পন্থক তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলল। আর কখনও কাঁদেনি পন্থক। কান্না কিসের। হাসিই বা কিসের? তাকে এ সবের উর্ধ্বে উঠতে হবে। আর কোন কিছু ভাবলে চলবে না।

মহানাম বলেছেন,—বিদর্শনা লাভ করলেই মনের গ্লানি দূরে যাবে। তারপর নির্বাণের সাধন।

পন্থক স্থির ভাবে রয়ে গেছে সাতদিন।

সেদিন সন্ধ্যায় বিরূঢ়ক ওকে দেখে বিমুগ্ধ নেত্রে শুধু বার বার ওকে দেখতে থাকে। ভগবানের উপদেশ তার কানে বিশেষ কিছু গেল না। সে শুধু দেখতে লাগল পন্থককে। এই কি সেই পন্থক?

সাতদিনে যেন সাত যুগ এগিয়ে গেছে পন্থক।

সবচেয়ে আনন্দ তার যে পন্থক ভগবানের প্রিয় হয়ে উঠেছে। আর তার ভয় কি? সে জানে বংশে একজন অর্হত্ব লাভ করলে সে তার চতুর্দশ পুরুষকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে। প্রবল মারের বশবর্তী না হলে সফলও হয়।

তার আর ভয় নেই। পন্থক মহত্ব লাভ করুক। নির্বাণ লাভ করুক। এই শান্তিই তার মরণে সবচেয়ে বড় শান্তি হবে।

উপদেশ শেষ হয়ে এসেছে। ভীড় কমতে লাগল। ভগবান উঠলেন। পন্থকও উঠল। অন্যান্য ভিক্ষুরাও উঠল।

বিরূঢ়ক ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সেদিকে। ভীড় ঠেলে এগোতে গিয়ে হোঁচট খেল, পড়ে গেল। তবু তাকে এগোতে হবে। গায়ে আজ শক্তি পাচ্ছে বিরূঢ়ক। দেহমনে আর বিন্দু-মাত্র দুর্বলতা নেই। ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো বিরূঢ়ক।

—পন্থক?

পন্থক চমকাল না। ধীর ভাবে পিছন ফিরে তাকাল। প্রশান্ত চোখে তাকাল।

আহা! সাতদিনে কি পরিবর্তন। বিরূঢ়ক আনন্দে অধীর।

—পন্থক। আমার সব সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। এর চেয়ে বেশি আর আমি কিছু চাইনি।

পন্থক কথা বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে।

—ভগবানের কাছে আজ আমার সর্বস্ব দান করবার প্রতি-শ্রুতি দিয়ে যাব। আর আমার কিছু প্রয়োজন নেই।

পন্থক তাকায়। বলে,—সে আপনার ইচ্ছা।

দাদু বলে ডাকে না। আপনি বলে।

পূর্ব আশ্রমের কোন ছায়া মনে যাতে রেখাপাত করতে না পারে, সেজন্য পন্থক কত সতর্ক।

বিরূঢ়ক কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে পন্থককে।

পন্থক ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে।

বলে,—আপনি যান। আমাকে আর প্রলোভন দেখাবেন না।

—তাই যাব। আমি চলেই যাব। তোর সাধনের বিঘ্ন হবো না। যাবার আগে আজ আমিও ভিখারী হয়ে যাব।

পন্থক ততক্ষণে চলে গেছে।

বিরূঢ়ক বিহারের অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শাস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভিপ্রায় জানায়। একথাও জানায় যে, বৈশালীর শ্রেষ্ঠী সে। আজ তার সর্বস্ব দান করবার প্রতিশ্রুতি দেবে।

তিনি সানন্দে ভগবানের কাছে নিয়ে যান তাকে।

সেখানে পন্থকও বসে আছে।

বিরূঢ়ক আর পন্থকের দিকে তাকায় না। শাস্তার পায়ের কাছে বসে অঝোরে কাঁদতে থাকে। শাস্তা তার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

বিরূঢ়ক বলে,—কারণ কিছু নেই ভগবান্। আজ আমার জীবনের সবচেয়ে ভাগ্যের দিন। আমি অতি কদাচারী এক শ্রেষ্ঠী। আপনি আমাকে কৃপা করুন।

ভগবান তথাগত মৃদু হাস্য করেন।

—আমার যা কিছু সম্পদ সব আমি আপনাকে দান করতে চাই।

ভগবান বুদ্ধ আবার মৃদু হাস্য করেন।—বেশ আপনি ভিক্ষুদের বস্ত্রদানের জন্যে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করুন। এই বিহারের উত্তর প্রান্তে সেই ভাণ্ডার নির্মাণ করুন।

বিরূঢ়ক কৃতার্থ হয়ে বলে,—যে আজ্ঞা প্রভু। তাই হবে।

বিরূঢ়ক ওঠে।

শাস্তা পন্থকের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাস্য করেন। কিছু বলেন না।

পন্থক নির্বাক। কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা আনন্দে।

শাস্তা পন্থককে কাছে ডাকেন। ওর মাথায় হাত রাখেন।

বলেন,—এই শ্রেষ্ঠী যে বস্ত্র ভাণ্ডার নির্মাণ করে দেবেন, তার ভার তুমি নিতে পারবে?

পন্থক মুখ নীচু করে ভাবে এ হয়তো এক পরীক্ষা।

বলে,—আপনি আদেশ করলে পারব।

ভগবান বুদ্ধ মৃদু হাস্য করেন।

পন্থক মাথা নীচু করে চিন্তা করতে থাকে। এ এক কঠিন পরীক্ষা। বিরূঢ়কের অর্থে যে বস্ত্র ভাণ্ডার তৈরী সে বস্ত্র ভাণ্ডারে তার মমত্ব বোধ আসা নিতান্তই স্বাভাবিক, হয়তো তার মাতামহের দান মনে করে তার অহঙ্কার আসাও স্বাভাবিক।

সংসারে যা স্বাভাবিক, তার ঊর্ধ্বে তাকে উঠতে হবে। তাই কি এই পরীক্ষা?

পন্থক মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকে।

বিরূঢ়ক বসে আছে। দৃষ্টি তার পন্থকের দিকে। উজ্জ্বল গৌরকান্তি নবীন ভিক্ষু পন্থকের দিকে। তার লোলচর্ম বেয়ে চোখের জল পড়ছে।

বার বার শাস্তার দিকে তাকিয়ে চোখ মুছছে।

শাস্তা হাত তুলে তাকে অভয় দিলেন। পন্থককে ইসারা করলেন বৃদ্ধকে শান্ত করতে।

পন্থক আস্তে আস্তে উঠে এসে বিরূঢ়কের হাত ধরে।

স্মিত হাস্যে বলে,—শান্ত হোন আপনি।

বিরূঢ়কের হাত ধরে বিহারের বাইরে নিয়ে আসে। বার বার তাকে শান্ত হতে বলে।

বিরূঢ়ক পন্থকের হাতখানা চেপে ধরে বলে,—আর কিছুই কি বলবি না?

ধীরে অথচ গম্ভীর স্বরে বলে,—আমার তো আর কিছু বলবার

থাকতে পারে না। আপনি কেন বোঝেন না, আমার বলবার কথা সব শেষ করে দিয়েছি এ জন্মের মত।

—তবু—।

—তবু কিছু নয়। আপনি প্রাসাদে ফিরে যান। ভগবানের আশ্রয় পেয়েছেন। আপনার ভাবনা কি? পঞ্চশীলের আশ্রয় নিয়ে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিন।

বিরূঢ়ক ধীরে ধীরে হাত ছেড়ে দেয়।

—বলছিস, আমার কোন ভয় নেই?

—না। কোন ভয় নেই।

বিরূঢ়ক ধীর পদক্ষেপে বিহার ছেড়ে বেরিয়ে যায়। পন্থকের দর্শনে, ওর কথায় বৃদ্ধের মনে এক অভাবনীয় আনন্দের বন্যা ডেকে ওঠে।

এই তো আনন্দ! পন্থক তাকে যে আজ কত বড় আনন্দ দিল তা পন্থক নিজেও জানে না। তার পটাচারার সন্তান যে এমন আনন্দময় হয়ে উঠবে, তা কি বিরূঢ়ক সেদিন জানত, যেদিন প্রাসাদের সামনে পটাচারাকে তাড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে পন্থককে ও কোলে তুলে নিয়েছিল।

পটাচারা তার শেষ দান দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

আজ পন্থক তাকে সর্বশেষ দান করল আনন্দ।

আর কোন ক্ষোভ নেই বিরূঢ়কের। এতকালের ক্ষোভ চোখের জলে ধুয়ে গেছে আজ। মার্জিত মনে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে।

অধ্যাপকের গৃহে মধুশ্রী পঙ্কজের বার্তার প্রতীক্ষা করছিল। পঙ্কজের কাছ থেকে কোন বার্তা এলো না। পঙ্কজও এলো না।

আড়ালে থেকে একটি কথা তার কানে গেল, পঙ্কজের সঙ্গে তার বিবাহ নাকি হতে পারে না। বিবাহ অন্যত্র স্থির করতে হবে।

কথাটা বলছিলেন তার মা।

মধুশ্রী শুনল। শোনামাত্র সর্বশরীর কেঁপে উঠল তার। বিস্ময়ে বেদনায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়। বুঝে উঠতে পারল না, কেন এ বিয়ে হবে না, কিসের বাধা ?

নিদারুণ এক জ্বালায় ভরে উঠল মন। তবু চুপ করে রইল। একটা কথাও কাউকে জানতে দিল না। অপেক্ষা করতে লাগল পঙ্কজের আগমনের।

পঙ্কজ এলে সব কথা জানতে পারবে। পঙ্কজ কি একবারও আসবে না ? নিশ্চয়ই আসবে। এলে সব শুনে একটা কোন পথ বার করবে।

এটা মধুশ্রী বেশ বুঝতে পারছিল যে, পঙ্কজকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে তার পক্ষে অসম্ভব। কোনমতেই সম্ভব নয়। মন যাকে দান করে ফেলেছে, তাকে দেহ দান করাটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। শুধু তাই নয়, দেহ দান তাকেই করা যায়, অন্য কাউকে নয়।

মনে মনে প্রতীক্ষার আশা নিয়ে ক্ষণ গুনতে গুনতে দিন কাটতে লাগল মধুশ্রীর।

দিন তিনেক কাটল। সেদিন দাদার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল মধুশ্রী। দাদার কি অসুখ করেছে ? মুখখানি অতি বিষণ্ণ। মাথায় দুটো হাত রেখে শুয়ে আছে।

মধুশ্রী ঘরে ঢুকতেই অনিরুদ্ধ তাকায়।

মধুশ্রী জিজ্ঞেস করে,—তোমার কি অসুখ করেছে ?

অনিরুদ্ধ আবার তাকায়। বলে,—না রে, মনটা বড় খারাপ।

—কেন দাদা ?

—একটা কথা শুনে পর্যন্ত মনকে স্থির করতে পারছিনে।

—কি কথা ? আমাকে বলতে কি আপত্তি আছে তোমার ?

অনিরুদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে,—না। আপত্তি কিছু নেই। তুই হয়তো শুনে কষ্ট পাবি।

মধুশ্রীর বুকটা কেঁপে ওঠে। তবে কি পঙ্কজের কিছু হয়েছে! আশঙ্কায় ওর মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে।

অনিরুদ্ধ বলে,—পঙ্কজ বাড়ি থেকে চলে গেছে।

মধুশ্রীর মুখটা নীচু হয়ে যায়। চোখের পাতা দুটি নামায়। একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে পারে না দাদাকে। কেন গেল ? তাকে ছেড়ে কেন চলে গেল ? এ-ও কি সম্ভব ?

—ওর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাবা যেদিন গেলেন, সেইদিনই রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

মধুশ্রীর ডাগর চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে। নিজেকে প্রাণপন শক্তিতে সংযত করবার চেষ্টা করে।

শুধু বলে,—কেন ?

—ওর সঙ্গে তোর বিয়ে সম্ভব নয়। ও জারজ।

জারজ! পঙ্কজ জারজ! এ কি শুনছে মধুশ্রী ? পৃথিবীটা এখনও কি চূর্ণ হয়ে যায়নি ?

ওর চোখের সমস্ত আলো এক মুহূর্তে নিভে গেল। এ কথা তবে পঙ্কজ কেন তাকে আগে বলেনি। কেন তাকে নিয়ে খেলা করেছে সব জেনে শুনে। পঙ্কজের কান্তিময় মুখখানা ভেসে ওঠে ওর মনে। সে মুখে তো পাপের লেশমাত্র ছিল না। ছলনার

বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না! তবে কেন এমন হলো? পন্থক তার সঙ্গে এত বড় প্রবঞ্চনা করল?

—কথাটা পন্থকও জানতো না।—বললে অনিরুদ্ধ।

জানতো না? ও নিজেও জানতো না! আবার বিস্ময়!

জানতো না বলেই হয়তো কিছু বলতে পারেনি। জানলে তাকে নিশ্চয়ই বলতো। পন্থক যে তাকে বঞ্চনা করেনি, এতে ওর হৃদয় আবার আবেগে ভরে ওঠে। এই মুহূর্তে পন্থককে ও প্রবঞ্চক ভেবেছিল। সেটা মিথ্যে। মিথ্যে না হয়ে পারে না। পন্থকের মুখের সরলতায়, ওর আন্তরিকতায় একটুও ছলনা ছিল না। তবু এ কথা কি করে বিশ্বাস করলেন তার বাবা যে পন্থক জারজ! তিনি কি পন্থককে দেখেও কিছু বুঝলেন না?

—ওর দাদু বাবাকে বললে কথাটা গোপনে। পন্থক কিন্তু শুনে ফেলল। শুনে সেই যে পথে বেরিয়ে গেল, আজ পর্যন্ত ফেরেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিরুদ্ধ।

আবার বলে,—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। তোর বিশ্বাস হয়?

মধুশ্রী আর দাঁড়াতে পারে না।

কথার উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কোথায়ই বা যাবে? নিজের ছোট ঘরটিতে এসে দ্বারের অর্গল বন্ধ করে দেয়। এতক্ষণে চোখের জলে ওর গাল ভেসে যায়। পাথরের মেজের ওপর শুয়ে পড়ে মধুশ্রী। অঝোরে কাঁদে। পন্থকের জীবনে এত বড় অভিশাপ যে এতদিন লুকোন ছিল, এ কথা কে জানতো? সংসারে কত বিস্ময় যে আছে, ভেবে পাওয়া ভার।

এত বড় অভিশাপ আর অপমানের বোঝা বুকে করে পন্থক কি আজও বেঁচে আছে? নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। ও তো একবার

তার কাছে আসতে পারত। তাকে স্পষ্ট সব কথা জানাতে পারত। ওকে কি তবু চলে যেতে বলতে পারত মধুশ্রী ?

পারত না। কিছুতেই না। ওর সবটুকু অপমান নিজের মাথায় তুলে নেবার চেষ্টাই হয়তো করত। তাতে যদি বাবাকে পরিত্যাগ করতে হতো, তাও করত ও।

তবু সেটা কি ভাল হতো? পন্থক হয়তো ভেবেছে, তার নিজের কলঙ্কিত জীবনে মধুশ্রীকে জড়িয়ে ওর জীবনকে আর কলঙ্কিত করে তুলবে না। এ কলঙ্ক যে তার কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হয়ে উঠত, এটা বোধহয় ভাবতে পারেনি পন্থক।

ভুল করেছে পন্থক। মধুশ্রীকে ভুল বুঝেছে। মধুশ্রীর দেহ নরম, কিন্তু মন খুব নরম নয়। ওর শরীর দৃঢ় কঠিন নয়, কিন্তু মনের দৃঢ়তার খবর পন্থক রাখত না। ভুল করেছে পন্থক।

মধুশ্রী আর কি-ই বা করতে পারে।

আরও দিনকতক কেটে গেছে। অতি বিস্বাদ দিনগুলো মধুশ্রীর কাছে ক্রমেই বিষময় হয়ে উঠছে। এত বড় বেদনা জানাবার ভাষা নেই, মানুষ নেই। একা একা নীরবে কতদিন আর সওয়া যায়!

মধুশ্রী কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না, কিন্তু বুঝতে পারছিল যে একটা কিছু ওকে করতেই হবে। কি করতে হবে ঠিক করে ভাববার মত মনের অবস্থা এখন নয়। তাই মনের একটু স্থৈর্যর প্রতীক্ষায় রয়েছে মধুশ্রী।

একদিন হঠাৎ তার কানে এলো, বাবা মাকে বলছেন,—আজ একটি বড় আনন্দের খবর আছে?

—কি?

—পন্থক, যে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। তার খোঁজ পাওয়া গেছে।

—কি ক'রে গো? ভাল আছে ছেলেটি?

—হ্যাঁ। শুধু ভাল নেই। সে আমার সুযোগ্য শিষ্যের কাজ করেছে।

—কি করেছে?

—ওর দাদু খবর পেয়েছেন, ও বিহারে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে। আহা! এই না হলে ছেলে। এমন ছাত্রের জন্যে গর্ব বোধ হয়।

অধ্যাপকের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখতে পায় মধুশ্রী। ও ঘরে ঢুকে পড়েছে।

মা বলছেন,—সত্যি! বড় ভাল ছেলে ছিল। অমন ছেলে ওই রকম একটা কিছু না হয়ে যায় না। ও কি আর যে সে ছেলে!

মধুশ্রী খুব সহজ হবার চেষ্টা করে বলে,—আপনি কি দেখে এলেন বাবা?

অধ্যাপক শান্ত স্বরে বলে,—না মা, শুনলাম। শুনে আমার বুকটা ভরে উঠল। তুমি জান না, ও বাড়ি থেকে কোন কারণে চলে গিয়েছিল।

—তাই নাকি?—মধুশ্রী যেন কিছু জানে না।

—হ্যাঁ, আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম, সেই গুরুতর কারণের জন্যে হয়তো বা সে দেহত্যাগ করতে পারে। ভাবতে গেলে কি কষ্ট যে আমার হতো মা! তুমি তো জান ছাত্ররা আমার সন্তানতুল্য! রাত্রে মাঝে মাঝে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হতো। ভাবতাম, আমার শিক্ষা কি এমন করে বিফল হবে? আজ জানলাম, বিফল হয়নি। আমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। জীবনের সবচেয়ে বড় পথ ও বেছে নিয়েছে।

অধ্যাপকের চোখ দুটি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—জান মা, ও

আজ আমারও প্রণম্য। শুনলাম, ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং ওকে আশ্রয় দিয়েছেন। ও যে কতবড় ভাগ্যবান, ও নিজেও জানে না।

মধুশ্রীর বুকটাও যেন আনন্দে ভরে ওঠে।

সংসারের সব চেয়ে নীচ অপমানের বোঝা নিয়ে সে আজ সকলের চেয়ে বড় হতে চলেছে। তার ভালবাসা ব্যর্থ হয়নি। তার ভালবাসার এত বড় সার্থকতা সে নিজেও কল্পনা করতে পারেনি। মধুশ্রী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অধ্যাপক মধুশ্রীর দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলেন। হয়তো মনে মনে ভাবেন পন্থককে তার কন্যার সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় একটি ভুল করে ফেলেছেন।

কয়েকটি মাস কেটে গেছে এর পর। কোন কোন মানুষের কাছে এ মাস কটি অতি সহজে পিচ্ছিল গতিতে কেটেছে। কিন্তু সংগ্রামী সাধকের পক্ষে নয়। পন্থক নিজেকে আত্মস্থ করবার নিদারুণ চেষ্টায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছে।

দশ পারমিতার সুকঠিন অভ্যাসে প্রতিটি মুহূর্তকে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা করছে। বিরূঢ়কের বস্ত্র ভাণ্ডারের ভাণ্ডারীর কাজ তাকে করতে হয়। ওই একটি মাত্র কাজ। এই কাজের সময়টুকু ছাড়া আর সবটা সময় আনন্দে নিমগ্ন হয়ে থাকবার চেষ্টা করে।

আত্মবিশ্লেষণ করবার চেষ্টায় সে মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে দেখে মনের অতলতা আর চাতুর্যপূর্ণ চিন্তার তরঙ্গের পর তরঙ্গ। চিন্তার তরঙ্গ। নিগূঢ় কামনার তরঙ্গ। অন্তরের দৃষ্টিতে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে মাঝে মাঝে ভীত হয়ে ওঠে।

গভীর রাত্রে ধ্যানে মগ্ন হয় পন্থক। তখন দেখতে পায় কত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মনের আনাচে কানাচে। এ এক আবিষ্কার। সম্পূর্ণ অন্য জগৎ আবিষ্কার। এ আনন্দে মুগ্ধ হতে হয়। কৌতূহলের আকর্ষণ থেকে আবার মনকে টেনে নিয়ে স্থির করবার চেষ্টায় মগ্ন হয়।

মনের নিস্তরঙ্গ অবস্থাই তার কাম্য। তখনই সে নির্বাণের অধিকারী হবে। প্রথমেই তাকে বিদর্শনা লাভ করতে হবে।

এই বিদর্শনা লাভ যে কত সুকঠিন কিছু দিনের ভেতরেই টের পায় পন্থক। তবু সাধন চলবে। কঠোর সাধনা।

ইদানীং প্রায় সর্ব সময়ই মৌন থাকে পন্থক। কারও সঙ্গে কথা বলে না। মৌনতা এক অসাধারণ মানস সাধন। এই শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে ধ্যানে মননে।

বিরূঢ়ক মাঝে মাঝে আসে। আবার চলে যায়। একটা কথাও বলে না পন্থক। অনেক সময় হয়তো বা তাকায়ও না। কারো দিকেই তাকায় না। মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলে। মাটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। এও সাধনার একটি প্রাথমিক অঙ্গ।

বিরূঢ়ক হয়তো বোঝে। ওর সাধকের অবস্থা কিছুটা অনুভব করেই হয়তো বা ওর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে না। ওকে একটুও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে না।

ঠিক এই সময় একদিন দুপুরে একজন ভিক্ষু এসে পন্থককে জানায়,—একজন রমণী আপনার দর্শন চাইছে।

—রমণী!—পন্থক মুহূর্তে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পরমুহূর্তে স্থিরস্বরে বলে,—দয়া করে বলে দিন রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—বলেছিলাম। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বলছেন, মাত্র একটা কথা তাঁর জিজ্ঞাস্য আছে। তিনি কিছুতেই যাবেন না।

—কিন্তু এখন আমার পক্ষে নারী দর্শন অসম্ভব।

—তিনি কোন কথা শুনতে চাইছেন না। সকলের পায়ে ধরে কেঁদে বলছেন। বড়ই আর্ত বলে বোধ হচ্ছে।

পন্থক একটু সময় চুপ করে থেকে কি যেন চিন্তা করে।

তারপর ধীরে ধীরে বলে,—চলুন।

অতি শান্ত পদক্ষেপে বিহারের বাইরে চত্বরে আসে পন্থক। বহির্বিহারের একটি ছোট কক্ষে এসে ভিক্ষু দাঁড়ায়।

পন্থক ঘরে ঢোকে। একবার মাত্র তাকায়।

মধুশ্রী এসেছে। সেই আয়তনয়না মধুশ্রী। একা এসেছে। সঙ্গে আর কেউ নেই।

মধুশ্রীর চোখদুটি তখনও সজল, আবেগে আর প্রতীক্ষায় বিক্ষুব্ধ দৃষ্টি। মধুশ্রী তাকায়। সর্বশরীর ওর কেঁপে ওঠে। এই কি সেই পন্থক! এই ত্রিচীবর বেষ্টিত মুণ্ডিক মস্তক উজ্জ্বল মুখশ্রী কি সেই পন্থকের ?

কত শান্ত, কত আনন্দ সুন্দর এই ভিক্ষু। পন্থক আজ ভিক্ষু।

কত কথা বলার ছিল। কিন্তু একটা কথাও তো বলতে পারছে না মধুশ্রী! তার বুক কেঁপে উঠছে। চোখের জল বাধা মানছে না আর।

পন্থক চোখ নামায়। গম্ভীর স্বরে বলে,—আপনার কি কোন প্রার্থনা আছে ?

পন্থক আজ তাকে আপনি বলছে! পূর্ব পরিচয় অস্বীকার করতে চাইছে! একবারও তাকাচ্ছে না আর।

কি বলবে মধুশ্রী ? চলে যাবে এখান থেকে ? এই মুহূর্তে ? না। ও বলবে। ওর শেষ কথা ও বলে যাবে।

ভগ্ন স্বরে বলে মধুশ্রী,—তুমি আমাকে কিছু বলবে না ?

পন্থক মাটির দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে,—আমার তো আপনাকে বলবার মত কিছু থাকতে পারে না ?

—কোনদিনই কি ছিল না ?

পন্থক তেমনি শান্ত স্বরে বলে,—সে কথা আজ বলতে পারিনে। আগের পন্থক মরে গেছে। এ কথাটা বোধহয় আপনার জানা ছিল না।

মধুশ্রী বলে,—জানি, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর নবজন্ম হয়। তবু আমাকে কি কিছু বলবে না ?

মধুশ্রীর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে।

পন্থক নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

মধুশ্রী বলে,—আমি এখন কি করব ?

একটু সময় নীরবে থেকে পন্থক বলে,—ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করুন।

মধুশ্রী চুপ করে থাকে একটু সময়। তারপর অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলে,—তোমার আদেশ মেনে নিলাম। কিন্তু কিছুই কি দেবে না আমায় ?

পন্থক আবার চুপ করে থাকে। একটা কথাও বলে না।

ত্রিচীবরের বহির্বাসের একটি খণ্ড ছিন্ন করে মধুশ্রীর সামনে ফেলে দেয়। তারপর পিছন ফিরে ধীর পদক্ষেপে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

মধুশ্রী চীবরের খণ্ডটি তুলে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মনের ওপর মেলে ধরে এই হরিদ্রাবর্ণ চীবর খণ্ড। মোহের ছায়া মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। এক স্পষ্ট আলোয় মনটা ভরে ওঠে ওর। আর কিছুই বলবার নেই।

এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই সে পেতে পারত না। এর চেয়ে বড় কথা কিছুই সে শুনতে পারত না। আর কোন বিক্ষোভ নেই। কোন অভিযোগ নেই, অভিমান নেই।

আস্তে আস্তে বিহার থেকে বেরিয়ে যায় মধুশ্রী!

এর পর সুদীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে। পন্থক এখন সংসারের সেতু পার হয়ে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। প্রথম বছরে দশ পারমিতা অভ্যাসের পর ধ্যানমার্গে বিদর্শনা লাভ করেছে। তারপর আরও কত কঠোর সাধনা করতে হয়েছে।

রাত্রির পর রাত্রি ঘুম ছিল না। সমস্ত রাত গভীর ধ্যানে কাটিয়েছে পন্থক।

দ্বিতীয় বছরের পরে এই অবস্থা দেখে শাস্তা একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন। আদেশ করলেন, বস্ত্র ভাণ্ডারের দায়িত্ব আর তাকে বহন করতে হবে না।

পন্থক এ আদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে তাকিয়ে থাকে।

সারিপুত্ত পাশে বসেছিলেন। তিনি বললেন—শ্রেষ্ঠী বিরূঢ়ক দেহত্যাগ করেছেন। তাই প্রভু তোমাকে আর বস্ত্র ভাণ্ডারের ভার দিতে চাইছেন না। এইমাত্র তিনি আমাদের বলছিলেন।

পন্থক তেমনি তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টি অন্তরে। বিরূঢ়কের মৃত্যু হয়েছে। তাতে কি তার মনে কোন বেদনার সঞ্চার হচ্ছে? কই না তো?

মানুষের মৃত্যু হবেই। এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে?

কিছুমাত্র বেদনার সঞ্চার হচ্ছে না ওর মনে। একটুও না।

ভিক্ষু প্রধান সারিপুত্ত হাসলেন।

ভগবান অমিতাভ হাসলেন।—সংসারে আর একটি মাত্র কাজ তোমার বাকী আছে পন্থক। সে কথা যথা সময়ে জানাব। তার পূর্বে অর্হত্বলাভ তোমার পক্ষে একটু কঠিন হয়ে উঠবে।

পন্থক নীরব রইল।

অন্য ভিক্ষুরা একটু বিস্মিত হয়ে কথা শোনে। তারা অনেকে বহু বছর সাধনা করছে। তাদের অর্হত্ব লাভের সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ একটি কথাও কখনও বলেন নি। অথচ পন্থকের সম্বন্ধে এমন কথা বললেন কেন? পন্থক তো মাত্র দু'বছর বিহারে বাস করছে।

অমিতাভ তাদের মনোভাব বুঝে হাসলেন আবার। বললেন,—তোমাদের তো কতবার বলেছি, জন্মের পর জন্ম সাধনা করে নির্বাণের মূলে এগিয়ে যেতে হয়। তোমরা জান না তোমাদের কত কোটি জন্ম এখানে আসতে হয়েছে। কত জন্ম ধরে নির্বাণের আশায় তোমরা এসেছ। এ জন্মের সাধনাকেই তোমরা সবটুকু বলে মনে করছ কেন? পন্থক পূর্বে বহু জন্ম ধরে অনেক সাধনা করে অনেক অগ্রসর হয়ে আছে। এত বেশী এগিয়ে আছে যে এ জন্মে একটু কিছু করলেই ও অর্হত্ব লাভ করবে। তোমরা এতে নিরাশ হয়ো না। বিস্মিত হয়ো না। তোমরাও এগিয়ে চলেছ। তোমাদেরও কোন ভয় নেই।

সবাই আশ্বস্ত হোল। সারিপুত্ত হাসলেন শুধু। তিনি জন্ম বৃত্তান্ত সব জানতেন।

পন্থক সব শুনেও নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে চুপ করে বসে রইল।

পঞ্চম বর্ষে পন্থক মনের নিস্তরঙ্গ ভাব অনুভব করছিল। সংসারের অনিত্যতার জ্ঞান তার পূর্ণ হয়ে এসেছিল। নির্বাণোন্মুখ অবস্থায় স্থির ভাবে দিনের পর দিন কাটছিল তার।

এই সময়টাতে ভগবান বুদ্ধ তাকে সঙ্গছাড়া করতেন না। তাঁর সঙ্গে সর্বত্র সব সময় থাকতে হতো।

পঞ্চম বর্ষের শেষের দিকে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর মহাবিহারে এলেন। সঙ্গে পন্থক, মহানাম, আরও অনেক ভিক্ষু।

মহাবিহারের উপস্থানশালায় বসেছিলেন সেদিন সকলে।

এক ভিক্ষু এসে জানাল, কোশলরাজ তাঁর দর্শনপ্রার্থী। এমন অসময়ে কোশলরাজ আসবেন কেউ ধারণা করতে পারেনি। তিনি অবশ্য সরাসরি বিহারের ভেতরে আসতে পারতেন। কিন্তু খবর দিয়ে আসা উচিত বলেই খবর দিয়েছিলেন।

প্রসেনজিৎ বুদ্ধের ভক্তদের অন্যতম। তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যেই প্রসেনজিৎ খবর পাঠালেন।

তথাগত তাঁকে আসতে আদেশ দিলেন।

প্রসেনজিৎ উপস্থানশালায় এলেন। এসে অতি বিনয় নিয়ে সকলকে সম্ভাষণ করলেন। তথাগতর আদেশে আসন গ্রহণ করলেন।

প্রসেনজিৎ বললেন,—একটি বিশেষ কারণে আপনার কাছে এসেছি প্রভু।

—বলুন।

—এ রাজ্যে হিংসা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েই যাচ্ছিল। আপনার কৃপায় অহিংসার মর্ম উপলব্ধি করছিল রাজ্যের প্রতিটি মানুষ। কিন্তু একটি দারুণ হিংসার বার্তা কিছুদিন হলো আমার কর্ণ-গোচর হচ্ছে! এর প্রতিবিধান না করতে পারলে হিংসার বিষ আবার ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র।

—কি বার্তা বলুন।

—এক ভয়াবহ দস্যুর কথা বলছিলাম। একে কোনমতেই দমন করতে পারছিনে। অথচ এর কার্যকলাপে হিংসার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে—বিশেষ করে শ্রেষ্ঠীকুলে আর ক্রীতদাসদের ভেতর। এব হিংসা বড়ই নির্মম, ভয়াবহ। এই ভয়াবহ আলোচনা চলছে সর্বত্র। সর্বত্র উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে ক্রমশ। তাই আপনার উপদেশ নিতে এলাম। কি করব বলে দিন।

—সে দস্যু কি চায়? যা চায় তাকে দিয়ে দিলেই হয়।

প্রসেনজিৎ বলেন,—কিছুই চায় না। এ এক আশ্চর্য

দস্যু নিজে কিছুই বলে না। কিছুই চায় না। হিংসাই এর বৃত্তি।

ভগবান তথাগত দস্যুর কথা সব জানতে চাইলেন।

প্রসেনজিৎ বলতে লাগলেন তার ভয়াবহ কার্যকলাপের কথা। বিশদভাবে সব বলতে লাগলেন। কিছুই বাদ দিলেন না। কারণ তিনি জানতেন, এ দস্যুকে দমন করবার সব প্রয়াস যখন বিফল হয়েছে, তখন বুদ্ধের শরণ নিতে হবে এখন।

অচিরবতী নদীতীরের দক্ষিণ দিকে সুবিস্তীর্ণ নিবিড় বনে এই দস্যুর বাস। অতি দীর্ঘকায় ভীষণদর্শন এই দস্যু। হাতে থাকে তার অসিচর্ম, পিঠে কার্মুক তীর। ভীষণ শক্তিশালী। কিন্তু বয়স্ক।

তার রক্তবর্ণ চক্ষু আর ঘোর নিনাদ শুনলে যে কোন মানুষেরই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠীকুলের। বৈশালী থেকে শ্রাবস্তী যাতায়াতের পথে সকলকেই এক নিদারুণ প্রান্তর পার হয়ে অচিরবতীর কূলে এসে নদী পার হতে হয়।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ লিচ্ছবিরাজের সঙ্গে একমত হয়ে অচিরবতী নদীর ওপর এক সেতু নির্মাণ করেছেন। এই সেতুই যাতায়াতের প্রধান পথ। যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুই রাজ্য এত অনুকূল হতেন না, যদি না শ্রেষ্ঠীরা এই পথে যাতায়াত করত।

বহু শ্রেষ্ঠী এই পথে ঐ লিচ্ছবিরাজ্য থেকে কোশলরাজ্যে অথবা কোশলরাজ্য থেকে লিচ্ছবিরাজ্যে বাণিজ্য করতে যায়। সঙ্গে থাকে তাদের কয়েকশ' করে গরুর গাড়ি। তার ভেতর খাদ্য, জ্বালানি কাঠ, বাণিজ্যের সম্ভার। এক স্থানের দ্রব্য আর এক স্থানে বিক্রয় করে আবার সেই রাজ্য থেকে অন্য সামগ্রী সম্ভার নিয়ে রওনা হয়। তাদের সঙ্গে অর্থাদি বড় একটা কিছু থাকে না।

এই দস্যু বার বার শ্রেষ্ঠীদের আক্রমণ করে তাদের দ্রব্য-সম্ভার লুঠ করে নিয়েছে।

শ্রেষ্ঠীদের সঙ্গে শকট চালক আর দাস থাকে বড় কম নয়। তবু কি করে যে এই দস্যু একা শ্রেষ্ঠীদের নিধন করে, এ এক আশ্চর্য কাণ্ড।

প্রায় সব ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠীকে বেছে নিয়ে অসির আঘাতে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে অচিরবতী নদীতে ভাসিয়ে দেয়। যাবার সময় দ্রব্যসম্ভার যা কিছু সব বিলিয়ে দেয় এই শকট চালক আর দাসদের ভেতর।

সম্প্রতি বৈশালীর এক প্রথিতযশা শ্রেষ্ঠী এই পথে বাণিজ্যে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল তার চারশ' গো-শকট। সেই পরিমাণে বাণিজ্য সম্ভার আর ক্রীতদাস। •

অচিরবতী নদীর তীরে এসে ওরা মণ্ডলাকারে শকট সাজিয়ে বিশ্রাম করছিল। রাত্রিটুকু এই নদীতীরে কাটিয়ে ভোরে আবার যাত্রা করবে।

এই শ্রেষ্ঠী ছিল প্রসেনজিতের অতি প্রিয়। ভগবান অমিতাভের শরণাগত।

সে জীবনে কারও কোন অনিষ্ট করেনি, অন্যায় ভাবে বাণিজ্য করেনি।

শকট চালক আর দাসদের বিশ্রাম করে আহার করবার আদেশ দিয়ে নিজে সামান্য কিছু তণ্ডুল চর্বন করে জল খেয়ে ধ্যান করতে বসেছিল।

অকস্মাৎ এক বিকট চীৎকারে তার ধ্যানভঙ্গ হলো।

ক্রীতদাসদের চীৎকারে চমকিত হয়ে তাকাতেই দেখলে তার সামনে মুক্ত অসি হাতে এক ভীষণকায় দস্যু।

শ্রেষ্ঠী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার কাছে হাত জোড় করে তাকে জানাল, সে তার সব নিতে পারে, কিন্তু তাকে যেন বধ না করে।

এই প্রাণটুকু সে বুদ্ধের সেবায় নিয়োগ করবে। দস্যু কিন্তু ভয়াবহ, নির্মম।

শ্রেষ্ঠীর চুল ধরে তাকে শকট থেকে টেনে নামাল। সকলের সামনে তার শিরচ্ছেদ করে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিলে।

আশ্চর্য যে, তার ক্রীতদাসরা শকট-চালকরা একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। এমন অন্যায় যে এ রাজ্যে কি করে হতে পারে মহারাজ প্রসেনজিৎ ভেবে পাচ্ছেন না। কি নিদারুণ বৈরীভাব! কি হীনতম হিংসা!

একটি নির্দোষ মানুষকে চোখের সামনে বধ করল, কেউ একটা প্রতিবাদ করল না।

কারণ অবশ্য ছিল। কারণটা লোভ।

তার ক্রীতদাসদের সামনে দাঁড়িয়ে দস্যু বললে,—সব ভাগ করে নাও তোমরা। ক্রীতদাস যারা আছ, রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাও।

সকলেই তারা এটা জানে। তারা আগেও শুনেছে, এ দস্যু নিজের জন্য এক দানা দ্রব্যও রাখবে না। সব বিলিয়ে দেবে তাদের ভেতর।

তাই তারা যেন খানিকটা চাইছিল যে দস্যু এসে শ্রেষ্ঠীকে বধ করুক।

দস্যু শুধু হাতে বনপ্রান্তে গিয়ে নদীর জলে নামল। স্নান সেরে তরবারি ধুয়ে ওপরে উঠে এলো। উঠে এসে বহুক্ষণ বসে রইল সেই নদীতীরে। নির্জন অন্ধকারে।

একটি দাস এত বেশী অর্থ আর বাণিজ্য সম্পদ সরিয়ে ফেলেছিল যে সে দস্যুর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তার সামনে এগিয়ে এলো।

দেখলো লোকটার চোখ দুটো রক্তবর্ণ, গাল দুটো চোখের জলে ভেসে গেছে।

ভীষণ বিস্মিত হলো সে দাস।

তবু সাহস করে বললে,—তুমি কিছু আহার করবে না? খাদ্য আছে আমাদের কাছে।

দস্যু দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বললে,—না, এখনও আমার ব্রত সমাপ্ত হয়নি। বৈশালী আর শ্রাবস্তীর সব শ্রেষ্ঠী বধ করব আর সব ক্রীতদাসদের মুক্ত করব, এই আমার পণ। যতদিন এই কাজ সমাধা না হয়, ততদিন বনের ফল আহার আর বনভূমি শয্যা।

বলে দস্যু বনের ভেতর দ্রুত পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শকট-চালকদের আর ক্রীতদাসদের ভেতর কেউ কেউ শ্রাবস্তীতে ফিরে এসে বললে, এক দস্যু শ্রেষ্ঠীকে হত্যা করে সব লুঠ করে নিয়েছে। তাদের ভেতরে অনেকে এত সম্পদ সরিয়ে ফেলেছিল যে তাদের আর জীবনেও দাসবৃত্তি করতে হবে না।

দস্যুকে তারা মনে মনে ভালবাসতে শুরু করেছে।

এইটে কোশলরাজের কাছে সবচেয়ে চিন্তার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রেষ্ঠী আর দাসদের ভেতরে এই যে জঘন্য বিদ্বেষ সৃষ্টি, এইটেই রাজ্যের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর। এমন বিদ্বেষ তো কোনদিন ছিল না।

এই দস্যুর সবচেয়ে বড় অপরাধ, এই হিংসা আর বিদ্বেষ বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর হতে পারে না।

তাঁর রাজ্যে অত্যাচারী শ্রেষ্ঠীও আছে, কিন্তু অতি সদাশয় শ্রেষ্ঠীও আছে। কদাচারী ক্রীতদাস আছে, আবার সদাচারীও আছে।

তাদের ভেতর এমন করে বিদ্বেষের মূল এর আগে কেউ

গোপন করতে পারেনি। এ বিদ্বেষের শেষে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণামের কথা ভেবে আশঙ্কিত হচ্ছেন কোশলরাজ।

এই শ্রেষ্ঠীর হত্যার পর কোশলরাজ কয়েকটি দাসকে বন্দী করেছিলেন, তাদের কাছেই এই দস্যুর বিষয়ে সব কিছু শুনেছেন। ক্ষুব্ধ হয়েছেন, চিন্তিত হয়েছেন।

এর পর তিনি কয়েকটি অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিলেন অচিরবতী নদীর তীরে বনপ্রান্তে। তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দস্যুর সন্ধান না পেয়ে যখন ফেরবার জন্যে অশ্বের মুখ ফেরাল, সেই সময়েই কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ তীর এসে বিঁধল তাদের পিঠে। তারা ধরাশায়ী হলো, আহত হয়ে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দস্যু এসে তাদের হত্যা করে ফেললো।

কিছুদিন পর আবার এক শ্রেষ্ঠী নিহত হলো। একই ভাবে অচিরবতী নদীর সেতুমূলে।

এবার কোশলরাজ অনেক সৈন্য পাঠালেন, আদেশ করলেন বনভূমির প্রতিটি বৃক্ষের মূলে অনুসন্ধান করে যেমন করে হোক দস্যুকে বন্দী করতে।

সৈন্যরা বনে ঢুকলো। বনের জন্তু মেরে গাছ কেটে গভীর অন্ধকারে প্রতিটি গোপন স্থানে দস্যুর সন্ধানে ফিরল। কিন্তু দস্যুকে পাওয়া গেল না। দস্যু আশ্চর্য ভাবেই অদৃশ্য হয়েছে।

কোনমতেই তাঁকে দমন করা যাচ্ছে না। অথচ ক্রমাগত এই হিংসার বিষে জর্জরিত হয়ে পড়েছে মানুষের মন। বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। কোন শ্রেষ্ঠী আর ও পথে যেতে সাহস করছে না। বাণিজ্য বন্ধ হবার জন্যে রাজকোষ ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছে।

ভীষণ দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছেন কোশলরাজ। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না, যে কি করে এ দস্যুকে দমন করবেন। কোন কিছু স্থির করতে না পেরেই তিনি বুদ্ধের কাছে এসেছেন।

এ দস্যুকে দমন করবার মত আর কাউকেই দেখছেন না তিনি।

এই পর্যন্ত বলে কোশলরাজ নীরব হলেন। উপস্থানশালার সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শাস্তার বাণীর অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগল।

ভগবান বুদ্ধ বহুক্ষণ নীরব রইলেন। প্রশান্ত জ্যোতির্ময় মুখে বিন্দুমাত্র বিস্ময় দেখা গেল না। প্রশান্তি একটুও ক্ষীণ হলো না।

স্থির হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। মনে হলো যেন আত্মস্থ হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে তাঁর বাহ্যজ্ঞান যখন ফিরে এলো, স্মিতহাস্যে তাকালেন পন্থকের দিকে। পন্থক পাশে বসেছিল। তার মুখও গভীর প্রশান্ত।

কিছুই বুঝল না কেউ। সকলেই শাস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাঁর মুখে কিছু শোনার প্রতীক্ষায়। ভগবান এতক্ষণে কথা বললেন। বললেন কোশলরাজকে,—আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না রাজন্। এ দস্যুর ভার আমি নিলাম।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অভয় পেয়ে যেন পূর্ণ আশ্বস্ত হলেন। বার বার প্রণাম জানালেন বুদ্ধের চরণে। তেমনি ধীর প্রশান্তি নিয়ে পদ্মকর্ণিকার মত আয়ত চোখ দুটি তুলে অমিতাভ তাকালেন পন্থকের দিকে।

ধীর স্বরে বললেন,—এ দস্যুর চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার ভার তোমাকেই নিতে হবে পন্থক। এ কাজ আর কেউ পারবে না।

পন্থক নত মস্তকে বসে রইল।

—তোমাকে এই দস্যুর অসির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। পারবে?

নির্ভীক নির্বিকার শান্ত স্বরে পন্থক শুধু বললে,—পারব।

ভিক্ষু সংঘের সকলেই বিস্মিত হলো। এত অর্হত থাকতে পন্থকের ওপর এ ভার দিলেন কেন? কোশলরাজ প্রসেনজিতও তাকালেন পন্থকের দিকে। কে এই সুন্দর যুবক ভিক্ষু, যার ওপর এত বড় দায়িত্ব অর্পণ করলেন ভগবান? এই যুবক কি পারবে সেই দুর্দান্ত দস্যুর চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে? চোখের সামনে যেন দেখলেন তারা, এই যুবক ভিক্ষুর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হবে অচিরবতী নদীতীরে। এই সুকুমার ভিক্ষুর তপ্তরক্তে ভেসে যাবে অচিরবতী নদী তীরভূমির বালুকা।

হতভাগ্য পন্থক! হয়তো দস্যুর তরবারিতে নিহত হয়েই তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে পারবে!

বুদ্ধের আদেশের তাৎপর্য কেউই বুঝল না। বোঝবার উপায় নেই।

তবু বাস্তব দৃষ্টিতে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে পন্থকের জীবন অবসান হবার আর বাকী নেই। পন্থক কিন্তু নির্বিকার। জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান প্রয়োজন, তা সে উপলব্ধি করেছে।

জীবন ধারণের ভয় নেই, মৃত্যুরও ভয় নেই।

পন্থক অতি সামান্য সময়ে সাধনক্ষেত্রে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, তা কোশলরাজ কেন অনেকেই ধারণা করতে পারেনি।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর কোশলরাজ বললেন,—ভগবন্, এই যুবক ভিক্ষু একা গেলে তো সে দস্যু অরণ্য থেকে বেরোবে না।

বুদ্ধ বললেন,—তবে এর সঙ্গে কোন শ্রেষ্ঠীকে প্রেরণ করুন।

কোশলরাজ চিন্তিত হয়ে বললেন,—কিন্তু এঁর ভরসায় কোন শ্রেষ্ঠী কি যেতে চাইবে এঁর সাথে?

বুদ্ধ হাসলেন। বললেন,—রাজন্, আপনি অকারণে শঙ্কিত হবেন না। আপনার সমগ্র সৈন্যবলের রক্ষা করবার যে শক্তি,

তার চেয়েও বেশী শক্তির পরিচয় পন্থক দিতে পারবে। আপনি নির্ভয়ে কোন শ্রেষ্ঠীকে এর সঙ্গে প্রেরণ করুন।

কোশলরাজ শুনে আরও একবার বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন,—আপনার যা আজ্ঞা তাই হবে। একজন সাহসী যুবক শ্রেষ্ঠীকে আমি এর সঙ্গে প্রেরণ করব। সঙ্গে প্রহরী কি থাকবে না?

দৃঢ় কণ্ঠে বুদ্ধ বললেন,—না।

এর পর স্থির হলো ওরা আগামী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে যাত্রা করবে। সঙ্গে থাকবে দুইশত গো-শকট। জেতবনের মহাবিহার থেকেই যাত্রা শুরু হবে। পন্থক কোন শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদে যেতে রাজী নয়। সর্বজ্ঞানী ভিক্ষু হয়ে সে গৃহস্থ শ্রেষ্ঠীর গৃহে পদার্পণ করবে না। ভগবান বুদ্ধ পন্থকের এ অভিলাষ সমর্থন করলেন। কোশলরাজও সমর্থন করলেন।

এই পর্যন্ত কথা হয়ে রইল।

কোশলরাজ প্রস্থান করলেন। অনেকেই উপস্থানশালা ত্যাগ করলেন।

ভগবান বুদ্ধ পন্থককে কাছে ডাকলেন।

সস্নেহে তার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করে বললেন,—ভয় নেই তোমার।

পন্থক বললে,—আপনার কৃপায় ভয় আমার নেই। তবু মনে হয়, এর ভেতর হয়তো বা আপনার কোন উদ্দেশ্য আছে।

বুদ্ধ হেসে বললেন,—সে উদ্দেশ্য তোমার মঙ্গলের জন্য।

—তা আমি জানি প্রভু।

পন্থক সর্বান্তঃকরণে ভগবানের শরণ নিলো।

আজ কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি। সকাল থেকেই জেতবনের মহাবিহারে গুঞ্জন শুরু হলো, আজ পন্থক যাত্রা শুরু করবে।

পন্থক প্রস্তুত। প্রস্তুতির বিশেষ কোন চিহ্ন তার দেহে বা মনে কোথাও নেই। সূর্যোদয়ের পূর্বে যথারীতি স্নানাদি সমাপন করে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইল। সূর্যোদয়ের পর বুদ্ধের চরণ দর্শন করে তাঁর উপদেশের প্রতীক্ষায় রইল।

বুদ্ধ আর তার দিকে তাকালেন না। কোন কথা বললেন না। নীরবে বসে রইলেন আত্মস্থ হয়ে।

পন্থক একবার ভাবল, তার সঙ্গে একটি কথাও কেন বললেন না? আবার ভাবল, হয়তো এরও কোন অর্থ আছে যা তার বোধগম্য নয়।

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে দুইশত গো-শকট নিয়ে এসে হাজির হলো সেই যুবক শ্রেষ্ঠী। জেতবনের আম্রকুঞ্জ ধুলিময় হয়ে উঠল।

পন্থক প্রস্তুত। নির্বিকার মনে স্মিতহাস্যে বাইরে এসে যুবক শ্রেষ্ঠীকে সম্ভাষণ করল।

শ্রেষ্ঠী যুবক প্রণাম জানিয়ে তাকে শকটে উঠিয়ে নিজে সেই শকটে উঠে বসল।

দুইশত গো-শকট সারিবদ্ধ হয়ে চলল অচিরবতী নদীর দিকে। ধুলিতে সমাচ্ছন্ন পথ কোলাহলে ভরে উঠল। শ্রাবস্তী নগরবাসী অনেককেই বলতে শোনা গেল,—ওই যাচ্ছে। ভিক্ষু পন্থক। দস্যু দমন করতে যাচ্ছে বুদ্ধের আদেশে। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

শকটের ভেতর পন্থক বসে আছে শ্রেষ্ঠীর পাশে। শ্রেষ্ঠীর

মুখে আশঙ্কার ছাপ সুস্পষ্ট। অত্যন্ত চঞ্চল দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে এদিক ওদিকে। এক এক বার পন্থকের দিকে তাকাচ্ছে। পন্থক তার সঙ্গে একটা কথাও বলছে না। ওর চোখ মুদ্রিত নয় বটে, কিন্তু দৃষ্টি অন্তরে। পন্থক অতি ধীর প্রশান্তিতে ডুবে রয়েছে যেন।

এ কেমন ভিক্ষু! একটা পরামর্শ নেই। একটা আলোচনা নেই। কি করে এই অল্পবয়সী ভিক্ষু দস্যুকে দমন করবে? শ্রেষ্ঠী যুবকের মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

তখন দ্বিপ্রহর প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে।

নীরব নিস্তব্ধ পন্থকের দিকে তাকিয়ে শ্রেষ্ঠী যুবক বার বার কটিবন্ধে একটি অতি শাণিত ছুরিকা দেখতে থাকে।

পন্থক দেখতে পায়। এতক্ষণে মুখ ফিরিয়ে বলে,—আপনার কটিবন্ধে এটি কি?

শ্রেষ্ঠী একটু ইতস্ততঃ করে বলে,—একটি ছুরিকা।

—ওটি এনেছেন কেন?

—আনবার কারণ, যদি দস্যু আক্রমণ করে তবে আত্মরক্ষা করতে পারব। আপনাকে যদি আক্রমণ করে আপনাকে রক্ষা করতে পারব। দেখবেন, আমি ভীতু নই। মল্লযুদ্ধের নিপুণতা আমার আয়ত্তে আছে। অতি অল্প সময়ে দস্যুকে পরাভূত করতে পারব।

পন্থক এতক্ষণে একটু হাসে,—কিন্তু ছুরিকা দিয়ে তো শত্রুকে পরাভূত করা যায় না। তাছাড়া আপনিই যদি দস্যুকে পরাভূত করতে পারেন, তবে আমার সঙ্গে আসা নিষ্প্রয়োজন। আমি এখনই জেতবনে ফিরে যেতে চাই।

—কিন্তু—

—কিন্তু নয়। হয় আপনি ওই ছুরিকা দূরে নিক্ষেপ করুন, না হয় আমাকে ফিরে যেতে দিন।

শ্রেষ্ঠী যুবক নির্বাক হয়ে শুনতে থাকে।

পন্থক বলে,—হিংসার চিহ্ন ওই ছুরিকা বহন করে আপনি ভীত হয়েছেন, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। ভগবান বুদ্ধের অভয় দানের উপরও আপনার বিশ্বাস নেই!

শ্রেষ্ঠী যুবক ঘর্মাক্ত মুখে বলে,—ঠিক তা নয়। সন্দেহ হয় যদি আপনি কিছু করতে না পারেন।

—তবে আমি আর আপনি দুজনেই প্রাণ দেব।

—প্রাণ দেব!—ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় শ্রেষ্ঠী যুবকের।

পন্থক হেসে বলে,—হ্যাঁ। প্রাণ দেব। তবে এ অঙ্গীকার আমি করছি যে আমার প্রাণ না নিয়ে দস্যু আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারেন।

শ্রেষ্ঠী যুবক অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে কটিবন্ধ থেকে ছুরিকা খুলে নিয়ে শকট থেকে বাইরে দূরে নিক্ষেপ করে।

পন্থক শ্রেষ্ঠী যুবকের হাত ধরে বলে,—আপনার কোন ভয় নেই। নির্ভয়ে বসে থাকুন।

শ্রেষ্ঠী যুবক আর একটি কথাও বলে না।

সূর্য অস্ত যায়। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কি ভয়াল নিস্তব্ধ অন্ধকার। প্রতিটি মানুষ সশঙ্কিত, নীরব। মনে এক চিন্তা, কখন সেই দস্যু এসে তাদের আক্রমণ করবে।

ধীরে ধীরে অচিরবতী নদীর সেতুমুখে পৌঁছোল তারা।

শকট চালকরা জিজ্ঞেস করল,—এইখানেই কি থাকতে হবে?

শ্রেষ্ঠী একটি কথাও বলতে পারছে না। বিশুষ্ক মুখে পন্থকের দিকে বার বার তাকায়।

পন্থক বলে,—বনপ্রান্তে এগিয়ে চলো।

শকটের সারি মন্থর গতিতে নদীতীরে অরণ্য প্রান্তে এগোতে থাকে। সামনে পড়ে একটি প্রপা। প্রপার দ্বার বন্ধ। দস্যুর

উপদ্রবের পর থেকে এ প্রপায় কোন প্রপাপালক কাজ করতে রাজী হয় না। বনপ্রান্তে এসে শকট মণ্ডলাকারে সাজিয়ে নেয় ওরা। বলদগুলোকে ছেড়ে দেয়।

সকলেই বিশ্রামের জন্য উন্মুখ।

জ্বালানী কাষ্ঠের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে। মৃদু কোলাহলের গুঞ্জন শুরু হয়। সকলেই আলোচনায় রত। কখন সেই ভীষণ দস্যুর আবির্ভাব হবে।

শকট চালকরা মণ্ডলাকারে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে। তণ্ডুল সিদ্ধ করতে শুরু করে। আহারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তারা। সবই করছে। কিন্তু মনে এক চিন্তা। দস্যুর চিন্তা।

শ্রেষ্ঠীর শকটে পন্থক অতি ধীর ভাবে বসে আছে। বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। পন্থক যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভগবান বুদ্ধের অভয় হস্ত।

এত স্পষ্ট করে ভগবানের দর্শন ধ্যানে বা স্বপ্নে এর আগে কখনও হয়নি। আনন্দে ভরে উঠছে পন্থকের মন। এক অভূতপূর্ব শক্তির বিকাশ হচ্ছে তার মনে। মুখখানি যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

শ্রেষ্ঠী পন্থকের পায়ে হাত রাখে।

পন্থক তাকায়।

রাত ক্রমে গভীর হয়ে আসছে। জন্তুর ক্ষীণ রব ভেসে আসছে কানে। সুবিস্তীর্ণ বালুময় নদীতীর এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতায় থমথম করছে।

শ্রেষ্ঠী শুষ্ককণ্ঠে বলে,—প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব তো প্রভু ?

পন্থক হাসে। পূর্ণ অভয়ের হাসি।

ঠিক এই সময়েই কাছাকাছি একটা কোলাহল শোনা যায়। কোলাহল ক্রমে বাড়তে থাকে। শকট চালকদের কোলাহল। দাস, ক্রীতদাস, মোটবাহকদের কোলাহল।

শকটের ভেতরে শ্রেষ্ঠী বসেছিল। চমকে দাঁড়িয়ে ওঠে।

পন্থক তাকে বলে,—আপনি স্থির হয়ে বসুন।

শ্রেষ্ঠী এবার বসে পড়ে। মুখ তার পাণ্ডুর। ভয়ে রক্তশূন্য।

পন্থক স্থির হয়ে বসে থাকে। ক্রমেই যেন তার বাহ্যিক দৃষ্টি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

কোলাহলের ভেতর থেকে এক ভীষণ কর্কশ কণ্ঠ শোনা যায়,—শ্রেষ্ঠী কোথায় বল। তোমাদের ভয় নেই।

—ওই শকটে।

ভীষণ চিৎকার আর ভয়াবহ কলরব। দাস শকটচালকরাই হয়তো বা শকট দেখিয়ে দেয়। তাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে এই দস্যুর প্রতি। তারা জানে, এ দস্যু তাদের কিছুই বলবে না। শ্রেষ্ঠীকে হত্যা করে এ সব কিছু তাদের ভেতরে বিলিয়ে দেবে। এ দস্যু তাদের প্রিয়। যেন তাদের আপন জন। তাদের কোলাহলে ভয়ের সঙ্গে কৌতুহল আর উল্লাসও সম্ভবত ছিল। এ বিদ্বেষজাত উল্লাসের খবর রাখত পন্থক।

পন্থক এত বড় বীভৎসতায়ও চমকিত হয় না। ও জানে, এরা জানে না এরা কি করছে।

শ্রেষ্ঠী যুবক, যে মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ বলে আগে আত্মশ্লাঘা করেছিল, তার দাঁতে দাঁত লাগবার উপক্রম হয়।

তার সামনে গিয়ে আবার পন্থক তাকে বলে,—ভয় নেই। স্থির হবার চেষ্টা করুন।

ঠিক এই সময় শকটের সামনে বজ্রের মত কণ্ঠ শোনা যায়,—নেমে আয় কুক্কুর!

পন্থক শকটের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসে।

সমস্ত বনভূমি অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নীরব হয়ে যায় প্রতিটি কণ্ঠ। গভীর অন্ধকারে পন্থকের চোখের শান্ত উজ্জ্বলতা দেখে স্তব্ধ হয়ে যায় সকলে।

পন্থকের মন এক অন্য জগতে। ও যেন দেখছে এক অতি শ্রদ্ধেয় মানুষ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তার কাছে এসেছে কিছু প্রয়োজনে।

হাত জোড় করে পন্থক এগিয়ে আসে। ভীষনদর্শণ দীর্ঘকায় রক্তচক্ষু দস্যু তার চোখে যেন পরম শ্রদ্ধেয় সুন্দর মনে হয়।

পন্থকের চোখে শ্রদ্ধা! শান্ত চোখে এ কি অপরিসীম শ্রদ্ধা!

অতি বিনীত স্বরে বলে পন্থক,—আপনি কে প্রভু? কি আপনার পরিচয়? আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

দস্যুর এক হাতে মশাল। আর এক হাতে মুক্ত অসি।

মশাল হাতে নিয়ে রক্তচক্ষে তাকায় দস্যু পন্থকের দিকে। গৌরকান্তি সুকুমার সুউন্নত কে এই যুবক? পরিধানে ত্রিচীবর —কে এই অপরূপ ভিক্ষু?

চোখে এর এত শ্রদ্ধা। এত ভালবাসা! কাকে শ্রদ্ধা করছে এই যুবক!

আশ্চর্য! বিস্মিত হয় দস্যু। ভয়ের লেশমাত্র নেই যুবকের চোখে।

দস্যুর মুক্ত অসি স্থির হয় আপনা-আপনি।

এ যুবক কি তাকে এত শ্রদ্ধা করছে? ও কি জানে না, সে এক কুখ্যাত ভয়াবহ দস্যু মাত্র?

—তুমি কে?

কণ্ঠের কর্কশতায় পন্থক কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি।

দস্যু আরও একবার বিস্মিত হয়। কি অপরূপ এই ভিক্ষু যুবকের শ্রী। কি আয়ত গভীর চোখ দুটি। কি বিনীত মধুর কণ্ঠ!

মনের কোথায় একটি কোমল স্থান ভিজে ওঠে।

পন্থক বলে,—আমি ভিক্ষু পন্থক। আপনার শরণাগত।

আমার শরণাগত! আশ্চর্য! দস্যু কি স্বপ্ন দেখছে? এই নিস্তব্ধ রজনীতে তপ্ত রক্তপিপাসু হয়ে এসে সে কি স্বপ্ন দেখছে? কেন তার বার বার মনে পড়ছে একটি শিশুমুখের ছবি। এ মুখ তো শিশুর মতই সরল, অপাপবিদ্ধ।

দস্যু কপাল থেকে ঘাম মোছে।

না। আর দেরী নয়। মুহূর্তে আবার সে কর্কশ হয়ে ওঠে। কঠোর স্বরে বলে,—সরে যাও তুমি। ভিক্ষু আমার বধ্য নয়। আমি শ্রেষ্ঠীকে চাই।

পন্থক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে শকটের দ্বার আগলে।

—পথ ছাড়ো। আবার বলছি সরে দাঁড়াও।

পন্থক নির্বিকার। পদ্মকর্ণিকার মত টানা টানা চোখ দুটি তুলে তাকিয়ে থাকে দস্যুর দিকে। চোখে কি অপরিসীম প্রেম! যেন আলিঙ্গন করতে চাইছে।

দস্যু স্তব্ধ হয়ে যায় আবার। আবার বুকের ভেতরে কোথায় যেন তার কি একটা কোমল সুর ধ্বনি তোলে। আবার কপালের ঘাম মোছে।

না। আর দেরী নয়।

মুক্ত অসি উঁচু করে বলে,—অবাধ্য ভিক্ষু, তবে তোমাকে বাধ্য হয়ে আমায় বধ করতে হবে।

পন্থক নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে,—আপনি আমাকে বধ করুন। তার আগে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

দস্যু ভীষণ বিস্মিত হয়।—কি প্রার্থনা?

—মৃত্যুর আগে আপনার নাম স্মরণ করে আপনাকে প্রণাম জানাতে জানাতে মরতে চাই। তাতে হয়তো আমার মৃত্যুর পরেও আমার অন্তিম প্রার্থনায় আপনার অন্তরে পরিবর্তন আসবে। আপনি নিজেকে জানতে পারবেন। বলুন, কি আপনার নাম প্রভু? কি পরিচয়?

দস্যু গম্ভীর স্বরে কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে বলে,—আমি দস্যু উপালী।

উপালী! পন্থকের কানে ঝনঝন করে বাজে অক্ষর কটি। উপালী! এ নাম সে কোথায় যেন শুনেছিল। হ্যাঁ, শুনেছিল তার দাদু বিরূঢ়কের মুখে। বিরূঢ়ক যখন অধ্যাপককে পন্থকের পরিচয় দিচ্ছিলেন, তখন এই নাম শুনেছিল। উপালী নামে এক ক্রীতদাস বিরূঢ়কের কন্যা পটাচারাকে নিয়ে পলায়ন করেছিল। তাদেরই সন্তান পন্থক।

এই কি সেই উপালী? তার পিতা?

আনন্দে ভগবান বুদ্ধের পাদপদ্ম স্মরণ করে পন্থক।

—আপনি উপালী?

দস্যুর অসি নেমে এসেছে মাটিতে। পন্থকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে,—তুমি কি উপালীকে চেন ভিক্ষু?

—আমি একজন উপালীকে জানি।

—কে সে?

—তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠী বিরূঢ়কের গৃহের ক্রীতদাস।

—বিরূঢ়ক!—দস্যুর মুখ ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে পন্থকের আরো কাছে এগিয়ে আসে অসি হাতে।

—শ্রেষ্ঠী বিরূঢ়ককে তুমি চেন? সেই বৃদ্ধ কুক্কুরকে তুমি জান?

রক্তচক্ষু দিয়ে যেন অগ্নিবর্ষণ হয়।

পন্থক ধীর স্বরে বলে,—তাঁর প্রতি অনর্থক ক্রোধ প্রকাশ করবেন না। তিনি আমার পূর্ব সংসারের মাতামহ।

—মাতামহ! তুমি তার কে? কে তুমি? বলো—বলো।—চীৎকার করে ওঠে দস্যু। অসি হাত থেকে খসে পড়ে যায়। পন্থকের কাছে এসে ওর মুখখানি দুহাতে ধরে বলে,—বল্ তুই কে? বল্।

পন্থক সব বুঝতে পারে এতক্ষণে। দস্যুর পায়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল।

—আপনিই আমার পূর্ব সংসারের পিতা।

দুহাতে পন্থককে জড়িয়ে ধরে উপালী।

দুর্দান্ত দস্যুর রক্তচক্ষু জলে ভরে ওঠে। দীর্ঘ শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। দুহাতে পন্থকের মুখখানি তুলে ধরে উপালী।

এই তো সেই দীর্ঘায়ত চোখের প্রতিবিম্ব। পটাচারার দুটি চোখের গভীরতার টলমল শান্ত ছায়া এ চোখে স্পষ্ট দেখতে পায় উপালী। তাই প্রথম থেকেই তার হৃদয় বার বার কোমল আবেগে ভরে উঠেছে এই সুকুমার ভিক্ষুর দিকে তাকিয়ে।

পটাচারার সন্তান। তার নিজের সন্তান আজ তার সামনে।

সন্তানের জন্য সে কি করতে পেরেছে জীবনে? কিছুই না। একটু যবচূর্ণও তার মুখে তুলে দিতে না পেরে তাকে ফেলে দিয়ে এসেছিল বৈশালীতে—বিরূঢ়কের প্রাসাদে।

সে আজ কতকালের কথা।

সেই দীঘলনয়না পটাচারা!

উপালীর শ্মশ্রু বেয়ে চোখের জল পড়ে। শ্রাবস্তীর গৃহে তার সামনে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেছিল পটাচারা। একটু অভিযোগ করেনি। একটু ক্ষুব্ধ হয়নি। এক হতভাগ্য ক্রীতদাসকে ভালবেসে সর্বস্ব দান করেছিল পটাচারা। প্রাণ পর্যন্ত।

আর উপালী? আজও বেঁচে আছে। পটাচারার মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে দিনের পর দিন। এখনও তাকে কত কাল প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কে জানে?

তার সন্তান আজ বুদ্ধের শরণাগত—ত্রিচীবরধারী ভিক্ষু! কেন? এ-ও কি তার পিতার হতভাগ্য অদৃষ্টের ফলে? এমন

পিতার সন্তান হয়ে সেও কি আজ সর্বত্যাগ করে পিতার কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে? মুণ্ডিত মস্তক পন্থকের মুখখানি প্রাণ ভরে দেখতে ইচ্ছে হয়।

তবু না। সে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়ায়।

—তুমি চলে যাও। আমার পিতা ডাক শোনবার অধিকার নেই। চলে যাও তুমি।

পন্থক মৃদু হাস্য করে বলে,—কেন পিতা?

নিস্তব্ধ বনপ্রান্তের অন্ধকারে শেষ সীমায় তাকাবার চেষ্টা করে গম্ভীর বেদনাহত স্বরে বলে উপালী,—তুই আমাকে পিতা বলে স্বীকার করিসনে। আমি হতভাগ্য ক্রীতদাস। আমি অতি ঘৃণ্য। আমার পরিচয়ে তুই নিজেকে আর নীচে নামাসনে। চলে যা।

—আপনি ভুল বলছেন পিতা!

—না। ভুল নয়। তুই সব কথা জানিসনে। তোর মা পটাচারা। না খেতে পেয়ে মারা গেছে। তার কোন দোষ ছিল না। তুই বিশ্বাস কর। সব দোষ আমার। তোর মা ছিলেন নিষ্পাপ দেবী। আমিই তাকে শ্রাবস্তীকে এনেছিলাম। এক মুঠো তণ্ডুলও তার মুখে তুলে দিতে পারিনি। তোকে একটু যবচূর্ণ সিদ্ধ করে খাওয়াতে পারিনি। কি করে আমি ভুলব তোর মায়ের কথা! আমি কি তোর পিতা হবার যোগ্য!

পন্থক এগিয়ে আসে।—আমি সবই জানি। আপনার কোন দোষ ছিল না।

—দোষ ছিল না? কি বলছিস তুই! তোর মায়ের অনাহারে মৃত্যুর কথা মনে করেও তুই কি কবে আমাকে ক্ষমা করতে পারবি? ক্ষমা করা তোর উচিত নয়। আমাকে তোর শাস্তি দেয়া উচিত। শাস্তি দিতে পারবি?

বলতে বলতে গাঢ় সুনীল আকাশের দিকে তাকায় উপালী।

—শাস্তি দে আমায়। তবে হয়তো আমার এ জ্বালা কমতে পারে। যেদিন রাত্রে তোর মায়ের মৃতদেহ এই নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম, সেদিন থেকে যে আমার বুকে আগুন জ্বলছে, আমি যে জ্বলে যাচ্ছি, সে কথা কি তুই জানিস। তুই যদি নিজে হাতে আমাকে শাস্তি দিস, তবে আমার এ জ্বালা বোধ হয় কমতে পারে। সন্তানের শাস্তিই আমার প্রাপ্য।

পন্থক এগিয়ে এসে উপালীর হাত ধরে।—আমি আবার বলছি, আপনি কোন অন্যায় করেননি।

উপালীর চোখ দুটো আবার শুকিয়ে ওঠে। বলে,—অন্যায় আমার, আর অন্যায় ওই শ্রেষ্ঠীদের। ওরাই আমাকে, শুধু আমাকে কেন, আমার মত বহু মানুষকে ক্রীতদাস করে রেখেছে। ভাগ্য পাষাণরুদ্ধ করে রেখেছে। ওরাই তোর মাকে মেরেছে।

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে উপালীর। বালু-তীর থেকে অসি কুড়িয়ে নেয়। ধীরে ধীরে চলে যেতে চায়।

পন্থক তার সামনে এসে দাঁড়ায়।—কোথায় যাচ্ছেন?

—আমার ব্রত এখনও শেষ হয়নি। আমার পথ ছাড়।

—কি আপনার ব্রত? আমি আপনার সন্তান হয়ে আপনার ব্রতে সাহায্য করতে তো পারি।

উপালী মুক্ত তরবারি হাতে তাকায়। বজ্র গম্ভীর স্বরে বলে,—আমার ব্রত বৈশালী আর শ্রাবস্তীর সব শ্রেষ্ঠীদের বধ করব। সব ক্রীতদাসদের মুক্ত করব।

পন্থক প্রশান্ত স্বরে বলে,—তাঁদের অপরাধ?

—অপরাধ। তারা মানুষকে পশুর মত করে রেখেছে। তোর মাকে মেরেছে। আমাকে দস্যু করেছে। তোকে ভিক্ষু করেছে। আবার তারা যাতে কারো সর্বনাশ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করে যাব। আর যেন কোন পটাচারা অনাহারে না মরে যায়! এই আমার শেষ কাজ।

পন্থক তেমনি গম্ভীর শান্ত স্বরে বলে,—শ্রেষ্ঠীদের কোন দোষ নেই পিতা। আপনি আবার ভুল করছেন।

—ভুল করছি। তবে দোষ কার?

—দোষ আমার আপনার সকলের। আমরাই সমাজে এ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছি। তাই এমন হতে পেরেছে। শ্রেষ্ঠীরাও আপনার মতই মানুষ। তাদের কি দোষ। তারাও সমাজের বিধি-ব্যবস্থার দাস।

—কে তবে এমন রীতির সৃষ্টি করল?

—বললাম তো, আমরা সকলেই। আমরা সকলে যদি না চাই এ রীতি থাকবে না। অন্য কোন রীতি নীতি মেনে নিতে হবে। তা-ও হয়তো কিছুকাল পরে মানুষ চাইবে না। আবার তার পরিবর্তন হবে। এ সবের পরিবর্তন তো হবেই। এর জন্য গুটিকতক মানুষকে আপনি হত্যা করলে তা নিতান্তই ভুল হবে পিতা।

উপালী অবাক হয়ে তাকায় পন্থকের দিকে। পন্থক যেন মহা আশার বাণী শুনিয়েছে।—তুই বলছিস। এ সবের পরিবর্তন হবে?

পন্থক দৃঢ় শান্ত স্বরে বলে,—হবেই। সংসারে কোন একটা ব্যবস্থা এক ভাবে থাকতে পারে না। পুরাতন চলে যায়, নতুন আসে। আবার নতুনও একদিন পুরাতন হয়ে যায়, আবার নতুনতর কোন রীতিকে মানুষ মেনে নেয়। তাই আজকের বৈশালীর শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠীদের অপরাধী করা কোনমতেই ঠিক হবে না। তারাও আমাদের মত মানুষ। তারা সবাই নিষ্ঠুর নয়। তাদের ভেতর অনেক মহৎ ব্যক্তিও আছেন। তাদের হত্যা করে আপনি যে বিদ্বেষ আর হিংসায় জ্বলছেন, এতে আপনার কোন লাভই হচ্ছে না। নিরপরাধ কতকগুলো মানুষ হত্যা করে শুধু নিজেই হিংসা করছেন। হিংসার বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছেন বহু মানুষের মনে। এই বীজ যদি মানুষের মনে

বনস্পতির রূপ দেয়, তবে শুধুমাত্র রক্তপাত আর বিদ্বেষের বিষে জ্বলে মরা ছাড়া আর কোন মঙ্গল হবে না মানুষের। আর সেজন্যে দায়ী হবেন আপনি।

উপালীর চোখে ভয়ের ছায়া নামে।—আমি দায়ী হবো! মানুষে মানুষে হানাহানি হবে। রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। আমি দায়ী হবো! তুই কি সত্যি বলছিস বাবা?

—আমি সত্য বলছি পিতা। একজন মানুষ যদি হিংসা করে, সে শুধু নিজেই হিংসা করে না, বহু মানুষের মনে সে হিংসার ভাব ছড়িয়ে দেয়। এ কথা সত্য। বিশ্বাস করুন আপনি।

উপালী ভীষণ ভীত হয়ে উঠেছে যেন। এক সর্বগ্রাসী ভয় ওকে গ্রাস করে ফেলতে আসছে।

—তবে উপায়? কি করব আমি?

হতাশা আর ভয়ের প্রতিধ্বনি শোনা যায় উপালীর কণ্ঠে।

পন্থক এগিয়ে আসে। উপালীকে জড়িয়ে ধরে।—ভয় নেই পিতা। আপনি অভয় পাবেন।

—কোথায়?

—শ্রাবস্তীতে। ভগবান বুদ্ধ আপনার জন্যই প্রতীক্ষা করছেন।

উপালীকে ধরে নিয়ে পন্থক ধীরে ধীরে শকটের কাছে যায়। শকট চালক, দাসেরা বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে দেখে দুর্দান্ত ভীষণ দস্যু—ভয়াবহ কালসর্পের মত মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে। আশ্চর্য প্রভাব পন্থকের আর ভগবান বুদ্ধের।

যুবক শ্রেষ্ঠী নেমে আসে এতক্ষণে। উপালীকে সঙ্গে নিয়ে পন্থক আর শ্রেষ্ঠী শকটে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আবার যাত্রা করে শ্রাবস্তীর দিকে।

সেখানে অপার ক্ষমা নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন ভগবান তথাগত—জেতবনের মহাবিহারে—উপালীর জন্যে।

লেখক পরিচিতি

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম গোকুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২২ সালে তাঁর জন্ম। পাবনা জেলার স্থল গ্রামে, এক বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারে। সেটা তাঁর মাতুলালয়।

বাবা চাকরী করতেন কলকাতায়। তাই ১৯৩৯ সালে কলকাতার স্কুল থেকেই প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হলেন। ছেলেবেলা থেকে আঁকার প্রতি অনুরাগ ছিল। তাই তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে চাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আই. এ. ক্লাসের ছাত্র হয়ে কলেজে ঢুকতে হলো। কারণ পরিবারের অনেকেই বাদ সেধেছিলেন। অঙ্কন-শিল্পীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-আশঙ্কায়।

তার আগে থেকেই খাতার পাতায় গল্প কবিতার ভীরু-সলজ্জ অভিসার আরম্ভ হয়েছে।

তারপর সংগীতাসক্তি। গানের সাধনায় স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন মেতে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সে-অধ্যায়ের শেষ হোল। না হলে হয়তো স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য পরিচয় লেখা হতো আজ।

বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে স্বরাজের পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে এলো আর খুব অন্ধকার। তখনই বুঝলেন যে, পৃথিবীটা শুধু ফুলের নয় কাঁটারও। এক বেলা একমুঠো খেয়ে চাকরির আশায় দিকে দিকে অন্বেষণ চললো।

১৯৪৩ সালে চাকরী করতে করতেই বি. এ. পাশ করলেন তিনি। 'রাগিনী' নামে বড় গল্পটিই প্রথম তাঁকে সাহিত্যিকের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। ছোট গল্প লেখায় স্বরাজ চিরকালই খুব কম আকর্ষণ অনুভব করেছেন। 'মাথুর', 'চন্দনডাঙ্গার হাট', 'মৌন বসন্ত' প্রভৃতি সব রচনা কৃতিত্বগুলিই তাঁর গভীর জীবন-বোধের উপন্যাস। তিনি লেখার কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ভারতীয় দর্শনের অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী রচনাকর্ম তাই পরম রমণীয়তায়, পবিত্র গভীরতায় উদ্ভাসিত, উচ্চারিত।